দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

৭৬ বর্ষ, ২১ সংখ্যা।। ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪।। ২৮ মাঘ, ১৪৩০।। যুগাব্দ - ৫১২৫।। website : www.eswastika.com

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE
NEW AGE PANELS

SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR

For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৬ বর্ষ ২১ সংখ্যা, ২৮ মাঘ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
১২ ফেব্রুয়ারি - ২০২৪, যুগাব্দ - ৫১২৫,
Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা
সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল
প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :
সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)
সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫
সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩
দাম : ১৬ টাকা
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024
R N I No. 5257/1957
দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

লক্ষ্য ৩০২৪! হ য ব র ল 'ইন্ডি'র হাতে পেনসিল
◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

দিদি, ও দিদি ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

আইনের মাধ্যমে হিন্দুরা মন্দির ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছে
◻ প্রদীপ সিংহ ◻ ৮

সরস্বতী পূজা শুধু সরস্বতী আরাধনা দিবস, অন্য কিছু নয়
◻ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী ◻ ১১

ঔপনিবেশিক ১৪ ফেব্রুয়ারি অতিক্রম করবো কীভাবে?
◻ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ◻ ১৩

নেতাজী সুভাষচন্দ্র ছিলেন রামময় ◻ পৃথ্বীশ দাশগুপ্ত ◻ ১৫

ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে মোকাবিলা করার আগে চীনের সতর্ক হওয়া উচিত ◻ সুদীপনারায়ণ ঘোষ ◻ ১৭

ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিত লৌহপুরুষ লালকৃষ্ণ আদবাণী
◻ ২২

রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে সম্মানিত পশ্চিমবঙ্গের ১১ জন ◻ ২৩

নদী থেকে দেবী—মা সরস্বতী ◻ ড. কৃষ্ণকান্ত সরকার ◻ ৩১

বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী
◻ প্রদীপ মারিক ◻ ৩২

সঙ্গম সাহিত্য এবং সমকালীন ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য
◻ নিখিল চিত্রকর ◻ ৩৩

সার্বিক ও সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে মোদী সরকারের অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট ◻ রতন কুমার ঘোষাল ◻ ৩৫

সরস্বতী বন্দনা স্কুলে রোজ হওয়া উচিত
◻ কল্যাণ গৌতম ◻ ৩৮

সাগরতলেই রয়েছে সম্পদের ভাণ্ডার
◻ শেখর সেনগুপ্ত ◻ ৪৩

পদ্মশ্রী পুরস্কারে ভূষিত হচ্ছেন বাংলাদেশের রবীন্দ্র সংগীতশিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী ◻ ৪৭

অশান্ত মায়ানমার—সুযোগ নিতে তৈরি চীন : উদ্বেগ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ◻ বিশ্বামিত্র ◻ ৪৮

নিয়মিত বিভাগ :

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সমাবেশ সমাচার : ২৯-৩০ ◻ খেলা : ৩৯ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ৪৯ ◻ সংবাদ প্রতিবেদন : ৫০

প্রকাশিত হবে ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

হিন্দুর ত্রাতা স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ

বঙ্গপ্রদেশে হিন্দুদের ত্রাতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ। মাঘী পূর্ণিমায় তাঁর আবির্ভাব। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ মানবতার সেবায় নিবেদিতপ্রাণ এক সংগঠন।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় স্বামী প্রণাবনন্দজী এবং ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ নিয়েই আলোকপাত করবেন কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :

INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market Kolkata-700 006**

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693

IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

সম্পাদকীয়

মা সরস্বতী

মাঘী শুক্লা শ্রীপঞ্চমী তিথিতে সমুদায় বিদ্যার্থী মা সরস্বতীর আরাধনায় ব্রতী হইয়া থাকেন। সর্ববিধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতেও সরস্বতীপূজার আয়োজন করা হইয়া থাকে। সরস্বতী হইলেন সর্ববিধ বিদ্যা তথা বিদ্যার্জনের দেবী। মা সরস্বতীর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া ভারতবর্ষ একদা জ্ঞানবিজ্ঞানে বিশ্বগুরুর মর্যাদা লাভ করিয়াছিল। বিশ্বের প্রাচীনতম সাহিত্য বেদে দেবীরূপে মা সরস্বতীর উল্লেখ রহিয়াছে। আদিতে সরস্বতী নদী নামে অভিহিত হইতেন। বেদে তাঁহাকে নদীতমে অম্বিতমে বলা হইয়াছে। ঋকবেদে সুবিশাল এবং গুরুত্বপূর্ণ নদীরূপে তাঁহার উল্লেখ পাওয়া যায়। জীবননির্বাহের সমস্ত প্রকার অনুকূলতা থাকায় প্রাচীন ঋষিগণ বেগবতী সরস্বতী নদীর তীরে প্রথম জ্ঞানের চর্চা শুরু করিয়াছিলেন। নদী তাহার দুই তীরবর্তী অঞ্চলকে সুজলা সুফলা রাখিয়া জ্ঞানচর্চার অনুকূলতা প্রদান করিয়াছে বলিয়াই ভারতীয় মানস তাঁহাকে মাতৃত্ব আরোপ করিয়াছে। কালের গর্ভে একসময় নদী সরস্বতী বিলুপ্ত হইলেও তিনি দেবীরূপে ভারতবাসীর হৃদয়ে স্থান করিয়া লইয়াছেন। সেই বৈদিক কাল হইতেই তিনি বিদ্যার দেবী রূপে ভারতবাসীর নিকট পূজিত হইয়া আসিতেছেন। ক্ষেত্র বিশেষে সরস্বতী দ্বিভুজা অথবা চতুর্ভুজা, হংসাবাহনা অথবা ময়ূরবাহনা রূপে পূজিত হইতেছেন। তাঁহার চারিহস্তে অক্ষমালা, কমণ্ডলু, বীণা ও বেদস্বরূপা পুস্তক থাকিলেও বঙ্গদেশে তিনি বীণাবাদনরতা দ্বিহস্ত রূপেই পূজিত হন। ভারতবর্ষ উদ্ভূত সমস্ত মত-পথের উপাসনা পদ্ধতিতেই মা সরস্বতী বিদ্যার দেবী। জৈনমতের চব্বিশজন শাসনদেবীর অন্যতমা হইলেন মা সরস্বতী এবং ষোলোজন বিদ্যাদেবীরও অন্যতমা তিনিই। বৌদ্ধসাহিত্যে তাঁহাকে পাঁচটি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। তাহা হইল, মহাসরস্বতী,বজ্রবীণা সরস্বতী, বজ্রসারদা, আর্যসরস্বতী ও আর্যবজ্র সরস্বতী। বিদ্যার দেবীরূপে তাঁহার পূজা শুধুমাত্র ভারতভূমিতেই সীমাবদ্ধ নহে। বৌদ্ধমত এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বিস্তারিত হইলে সরস্বতীর নামও পরিবর্তিত হইয়াছে। তিব্বতে তাঁহার নাম হইয়াছে ইয়াং চেন মা। চীনদেশে মিয়াওয়িন মু। জাপানে বেঞ্জাইতেন। বিদ্যার সাধনা করিয়াই জাপানিরা আজ সর্ববিষয়ের ভৌতিক বিদ্যায় অগ্রগণ্য। জাপানে শতাধিক বিদ্যাদেবীর মন্দির রহিয়াছে। রাজধানী টোকিয়োতে তাহাদের দেশের সর্ববৃহৎ সরস্বতী মন্দির রহিয়াছে। বিশ্বের সর্বাধিক মুসলমান জনসংখ্যার দেশ ইন্দোনেশিয়াতে মা সরস্বতীর বৃহৎ মন্দির রহিয়াছে। আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে ষোলোফুট উচ্চতাবিশিষ্ট সরস্বতী প্রতিমা বিশ্বের পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল ব্যতীত মায়ানমার, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, এমনকী গ্রিসেও বিদ্যার দেবীরূপে সরস্বতী বিভিন্ন নামে কোথাও দ্বিভুজা, কোথাও চতুর্ভুজা রূপে পূজিত হইতেছেন। সর্বত্রই তিনি বিদ্যা, প্রজ্ঞা, সংগীত ও শিল্পের দেবী রূপেই পূজিত হইতেছেন। দেবী ভাগবত অনুসারে মা সরস্বতী বেদ প্রসব করিয়াছেন। তাই তাঁহাকে বিদ্যাস্থান বলা হইয়াছে। তিনি বাক্য প্রদান করেন বলিয়া বাকদেবী। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে উক্ত ত্রিদেবীর তিনি মহাসরস্বতী।

মা সরস্বতীকে কোনো বিশেষ দেশ অথবা কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যায় না। কোনো নির্দিষ্ট ধর্মেরও অন্তর্ভুক্ত তিনি নহেন। সকল শ্রেণীর বিদ্যা লাভার্থীর তিনি আরাধ্যা। ভারতের পরমাণু বিজ্ঞানী তথা পূর্বতন রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালাম উপাসনা পদ্ধতিতে ভিন্ন হইয়াও নিজগৃহে সরস্বতীর প্রতিমা রাখিতেন, এহেন বিদ্যাদেবীকে লইয়া ভারতবিরোধীরা নিম্নরুচির রাজনীতি করিতেও ছাড়েন নাই। তাহাদের মদতপুষ্ট এক শিল্পী মা সরস্বতীর বিকৃত চিত্র অঙ্কন করিয়া ভারতবাসীর ভাবাবেগকে আঘাত হানিয়াছেন। বিদ্যালয়ে সরস্বতী বন্দনাকে তাহারা শিক্ষায় গৈরিকীকরণ বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন। ধর্মীয় কট্টরপন্থার চাপে ভোটভিখারি রাজনীতিকরা এই রাজ্যের কোনো কোনো বিদ্যালয়ে সরস্বতী পূজায় বাধাদান করিয়াছে। প্রতিবেশী দেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বৎসর সরস্বতীপূজা না করিবার ফতোয়া জারি করা হইয়াছে। দুঃখের বিষয় হইল, বেশ কয়েক বৎসর হইতে সরস্বতী পূজার দিনটিকে বাঙ্গালির প্রেমদিবস তথা ভ্যালেন্টাইন ডে বলিয়া প্রচার করা হইতেছে। সেই প্রচারে অল্পবয়সি ও তরলমতি কিশোর-কিশোরীরা বিভ্রান্তও হইতেছে। আসলে ইহা এক বিশ্ববাণিজ্যিক চক্রান্ত। ইহার সঙ্গে রহিয়াছে ভারতবাসীকে ঔপনিবেশিক মানসিকতায় পুনরায় পুষ্ট করিবার চক্রান্ত। সরস্বতীপূজা শুধুমাত্র বিদ্যাদেবীর আরাধনার দিন, বিদ্যার প্রতি নিষ্ঠার দিন, বিদ্যার প্রতিই প্রেম নিবেদন করিবার দিন, ইহা ভুলিলে চলিবে না। ঔপনিবেশিক মানসিকতায় শৃঙ্খলিত করিবার সমস্ত প্রকার চক্রান্তকে অতিক্রম করিতে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করিতেই হইবে।

সুভাষিতম্

বেদমূলমিদং জ্ঞানং ভার্যামূলমিদং গৃহম্।
কৃষিমূলমিদং ধান্যং ধনমূলমিদং জগৎ।।

সমস্ত প্রকার জ্ঞানের মূল হলো বেদ, পরিবারের মূল হলো গৃহবধূ, ধান্যাদি শস্যের মূল হলো কৃষিকাজ এবং জগতের মূল হলো ধনসম্পদ।

লক্ষ্য ৩০২৪!

হ য ব র ল 'ইন্ডি'র হাতে পেনসিল

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

মুনশিয়ানা আমি ধার করতে ভালোবাসি। তাই উবে যাওয়া ইন্ডিজোটের এক নেতার কথা ধার করলাম। তিনি বলেন ২০২৪ নয়, ইন্ডিজোট ৩০২৪-এর ভোট জিততে চায়। ভগবদগীতায় শ্রীভগবান অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছিলেন অনুশীলন আর অভ্যাসের। সাতাশ দলের ইন্ডিজোটের গঙ্গাযাত্রা শুরু হয়েছে। ঘাটকাজ সারতে জোটের সব চাইতে দুর্বল নেতা 'ঝুল গান্ধী' মণিপুর থেকে মুম্বই নতুন যাত্রাপালা শুরু করেছেন। ইন্ডিজোট থেকে মমতা, কেজরি আর নীতীশ সরেছেন। শুনেছি পওয়ার আর দক্ষিণের কেউ সরতে পারেন।

ইন্ডিজেটের হাতে কেবল পেনসিল। তার অন্য নাম কংগ্রেস আর শ্রীকাকেশ্বর কুচকুচে বাম। দলীয় রাজনীতিতে তারা অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু তারা সাংস্কৃতিক জিহাদি আর দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। তাই ৩০২৪-এর চার আর হাতে পেনসিল। এক্কেবারে হাজার বছরের প্রতীক। সংসদের ৫৪৩ আসনের ভিতর দক্ষিণ ভারতের ১০০ আসন বিজেপির হাতে নেই। তার কুড়ি শতাংশ পেলে ইন্দিরা ইজ ইন্ডিয়ার মতো মোদী মিনস মহাভারত হতে বাধ্য। তা ইতিহাসের পাতায় ঢুকে যাবে। আর সেটাই হতে চলেছে।

তৃণমূল কংগ্রেস ছোটো আঞ্চলিক দল। মমতা-সহ তার বেশিরভাগ নেতা আত্মহনন পছন্দ করেন। মানুষ চোর, বাটপার, দালাল যাই বলুক তাদের কিছু যায় আসে না। দুর্নীতি তাদের সহজাত। বিজেপি আর নরেন্দ্র মোদীর বড়ো সুবিধা তৃণমূলের মতো অন্য বিরোধীরা সমান ভোঁতা। তারা সকলেই যতটা মোদী বিরোধী। তার থেকে অনেক কম বিজেপি বিরোধী। সমীক্ষা বলে বিজেপির ছাব্বিশ থেকে তিরিশ শতাংশ ভোট আসে নরেন্দ্র মোদীকে সামনে রেখে। ২০১৯-এর লোকসভা ভোটের পর এই সমীক্ষা মান্যতা পেয়েছে। বিজেপি আর নরেন্দ্র মোদী সমার্থক হয়ে গিয়েছেন। মমতার দলেও তাই। তবে দু'জনে আকাশ-পাতালের ফারাক। মোদী আকাশ আর মমতা পাতালেরও নীচে। দলের ভিতর মমতাকে অনেকেই চোরেদের কর্ত্রী বলে মানেন। অনেককে জলে ফেলার জন্য তাঁকে দায়ী করেন। মোদী সম্বন্ধে ধারণা বিপরীত। তিনি দলের কাছে নিষ্কলঙ্ক আর অমলিন।

প্রশাসনে অমত থাকলেও মোদী তার এতটাই মান্যতা দেন যে সমালোচকের কিছু বলার থাকে না। অনেকেই মমতার কু-আলোচনা করেন। ইন্ডিজোটের অন্য কোনো নেতার এ বদনাম নেই। ক্ষমতলোভী, বিভেদকারী আর দালাল বদনাম অনেকের রয়েছে। তবে চোরেদের মদতদাতার মতো নিম্নরুচির সমালোচনা কানে আসেনি। ঠিক এই কারণেই মমতা ইন্ডি জোটের অনেক নেতার থেকে পিছিয়ে রয়েছেন। তাই মুখ লুকোতে হয়তো জোট ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছেন। সম্প্রতি তিন রাজ্যের নির্বাচনে কংগ্রেসের ভরাডুবি হয়েছে। বিজেপির থেকে কংগ্রেসের শেখা উচিত মুখ ছাড়া কী করে নির্বাচন জিততে হয়। সরাসরি কোনো মুখ না রেখেও মুখ তৈরি করা যায়। পরিবারকেন্দ্রিক কংগ্রেসের ঘটে সে রাজনীতি কতটা ঢুকবে আমার জানা নেই। প্রণব মুখোপাধ্যায় তাঁর ডাইরিতে দেখিয়েছেন নেহরু পরিবার কীভাবে দেশ আর দলকে আত্মসাৎ করেছিল। মনে হয় উত্তর-পশ্চিম-পূর্ব আর উত্তর-পূর্ব ভারতের আনুমানিক চারশো আসনের বেশিরভাগটাই এবার বিজেপির ঝুলিতে আসবে।

> **ইন্ডিজোট এখন জীবনমৃতের ছবিঘর। ভোটে তারা নতুন করে মরে প্রমাণ করবে এবার তারা মরেছে। ভোটের আগে তারা মরেনি। ইন্ডির মতো জোট ভারতে বহুবার জন্ম নিয়েছে আর কয়েকদিনের মধ্যেই তাদের মৃত্যু হয়েছে।**

রাজ্যের বাইরে মমতা ইন্ডি জোটের সঙ্গী। মমতার কথায় জোটের সবচেয়ে বড়ো দলের যদি এই হাল হয় তাহলে বাকি ২৬ দলের কী সর্বনাশ হতে চলেছে তা আন্দাজ করা যায়। মমতাও যে সেই ধাক্কার হাত থেকে বাঁচবেন না, কংগ্রেসের ধুলিসাৎ হয়ে যাওয়ার ভবিষদ্বাণী ২০২৪-এর লোকসভা ভোট শেষ হয়ে গিয়েছে। বিজেপির অনায়াস আর বিপুল জয় লেখা হয়ে গিয়েছে। কংগ্রেস তাড়িত ইন্ডিজোট তা বুঝে গিয়েছে। 'শ্রীকাকেশ্বর বাম' আর 'কুচকুচে কংগ্রেস' ছাড়া সবাই বোধহয় বিজেপির বিপুল জয় মেনে নিয়েছে। তাই পেনসিল হাতে ৩০২৪-এর প্রস্তুতি চলছে। ইন্ডিজোট এখন জীবনমৃতের ছবিঘর। ভোটে তারা নতুন করে মরে প্রমাণ করবে এবার তারা মরেছে। ভোটের আগে তারা মরেনি। ইন্ডির মতো জোট ভারতে বহুবার জন্ম নিয়েছে আর কয়েকদিনের মধ্যেই তাদের মৃত্যু হয়েছে। তাই নতুন করে আর ইন্ডির অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর আলোচনার প্রয়োজন নেই। □

দিদি, ও দিদি...

নির্বাকেষু দিদি,

আপনি অনেক কথাই বলছেন দিদি। কিন্তু সবই আবোল তাবোল। কেউ না বুঝুক আমি জানি, এ সবই ইচ্ছাকৃত। আসল কথাগুলো, মানে প্রশ্নের উত্তরগুলো সবই আপনার জানা কিন্তু আপনি অন্য নানা কথায় গুলিয়ে দিয়ে সবাইকে ঘেঁটে ঘ করে রেখে দিয়েছেন।

আপনার দলের নেতাদের অবস্থা কেমন জানেন? 'ত্রিশঙ্কু' বলা যেতে পারে। তারা বুঝতে পারছেন 'ইপো নৌকো'! আপনার সঙ্গে ভাইপোর যে সব কিছু কথা বলে মান-অভিমানের খেলা সেটা অনেকেই বুঝতে পারছেন না। আপনার দু'জনেই আসলে একই জিনিস চান। কিন্তু ভাবটা এমন যেন, পিসি-ভাইপো লড়াই চলছে। আসলে দুজনেই চান যে ভাবে হোক জেলযাত্রা রুখে দেওয়া। না, দিদি আপনার নয়। ভাইপোর জেলযাত্রা। আপনি কিং পিন হলেও চালক মানুষ তো বরাবরই। তাই সযত্নে নিজেকে দূরে রেখেছেন। সরাসরি কোনও দুর্নীতিতে আপনার নাম আসছে না। তবে মদত দেওয়া, জেনেও না জানার ভান করে আসলে সমর্থন দেওয়াও কম দোষের নয়। তবে সেটা আইনের চোখে কতটা প্রমাণসাপেক্ষ তা আমার জানা নেই।

তবে দিদি আপনার ভাইপো রত্নটি কিন্তু ধুরন্ধর। বউ, শ্যালিকা, শ্বশুর, বাবা, মা সবাইকে দিয়ে দুর্নীতি করিয়েছে। নিজে কিচ্ছুটি জানে না বললেও সবাই জানে তিনিই সব। আর তা প্রমাণ করা হয় তো খুব কিছু কঠিনও নয়। তবে দিদি, এখন আপনার পোষ মেনে যাওয়া কুণাল ঘোষকে কিন্তু সমঝে চলবেন। আপনি যে সব চিটফান্ডের সব চেয়ে বড়ো সুবিধাভোগী সেটা কিন্তু ও বিশ্বাস থেকেই বলেছিল। এখনও মনে মনে সেই ধারণাই পোষণ করেন। তিনি আপনাকে 'সর্বময়নেত্রী' বলে সম্বোধন করলেও আসলে ভাইপোর হয়ে আপনার পিছনে লেগে চলেছেন। উদাহরণের শেষ নেই।

তবে ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের শুরুতে আপাতত মূল প্রশ্ন ভাইপো কোথায়? সন্দেশখালির শাহজাহানের থেকেও রহস্যময় তাঁর অবস্থান। তিনি দিল্লি, কলকাতা না বিদেশে? কেউ বলছেন সিঙ্গাপুরে, কেউ বলছেন দুবাইয়ে। তবে একটা কথা ঠিক যে তিনি আপনার পাশে নেই। তাঁর ধরনায় আপনি যেমন ব্রাত্য ছিলেন তেমন আপনার ধরনায় তাঁর ছায়া দেখা যায়নি। ফ্লপ ধরনাটা তুলে দিতে আপনি দিল্লি যাত্রার কথা বলেছিলেন। খুব দরকার বলে জানিয়েছিলেন। সেই সময়ে এটাও বলেছিলেন যে ফিরে এসে একদিন বাদেই বাজেট পেশ। কিন্তু যাওয়ার দিন বিমান তৈরি, রাস্তায় রাস্তায় পুলিশ ভিআইপি মুভমেন্টের জন্য ব্যবস্থা করে ফেলেছে আর আপনি ছোট্ট সাংবাদিক বৈঠকে শুধু বলে দিলেন, আপনি দিল্লি যাচ্ছেন না। কারণ, বাজেট। এটা কি আপনার হঠাৎ মনে হলো যে, বাজেট আছে? আপনার বাজেট সাধারণত ঢপেরই হয়। তবু লোকসভা নির্বাচনের আগে তাতে কিছু ঘোষণা করার পরিকল্পনা রয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু আপনি দু'দিন আগে বললেন দিল্লি থেকে ফিরে বাজেট পেশ। তার পরেই বলে দিলেন, এই রে, বাজেটের আগে দিল্লি কী করে যাওয়া যায়? দিদি, রহস্য এখানেই। আপনি সাংবাদিকদের কোনও প্রশ্ন করার সুযোগ দেননি কিন্তু আপনার দলের নেতা-কর্মীদের মনেও প্রশ্ন, দিদি কেন দিল্লি গেলেন না?

যাঁদের সঙ্গে দেখা করবেন বলে ভেবেছিলেন তাঁরা কি কেউ সময় দিলেন না? আপনাকে কি জোটের বন্ধুরা অচ্ছুত করে রেখেছে? সেটা হতেই পারে। কারণ, জোটের বড়ো দল কংগ্রেস যে ৪০টা আসনও পাবে না সেই সত্য আপনি নিজেই বলে দিয়েছেন।

দিদি আরও একটা প্রশ্নের উত্তর সবাই আপনার থেকে জানতে চায়। বলেই ফেলি। ক'দিন আগেই আপনি যাঁকে 'দলের সম্পদ' বলেছেন সেই নায়ক সাংসদ তিনটি সরকরি পদ থেকে পদত্যাগ করলেন কেন? আমি জানি, দেব আপনার থেকে দূরত্ব বাড়াতে চাইছে অনেক দিন ধরেই। আপনি দেবকে রাজ্যের পর্যটনের অ্যাম্বাস্যাডর করতে চেয়েছিলে। করেও ছিলেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত দেব কোনও কাজ করেননি। ঘাটালের স্থানীয় নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর গোলমাল অনেক দিনের। কিন্তু এখন দেব কেন দূরত্ব স্পষ্ট করে দিলেন? সত্যি দিদি বলুন না! আপনার কথাতেই তো দেবও দুর্নীতির অংশ হয়েছিলেন। কিন্তু এখন আপনি মানে আপনার দল কেন হাত ধুয়ে নিচ্ছে? আপনি অবশ্য বলে দেবেন, 'অপপ্রচার'। সেটা তো সকলের জন্য। আমায় ভাই হিসাবে আলাদা করে বলবেন, আসল কারণটা? □

অতিথি কলম

প্রদীপ সিংহ

আইনের মাধ্যম হিন্দুরা মন্দির ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছে

‘আজ বিজয়ের সময় নয়, আজ বিনয়ের সময়। এগুলি আমরা কারোর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছি না। দেশের আইন কানুন এবং সংবিধানসম্মত উপায়ে তা আমাদের কাছে ফিরে আসছে। আমরা তরোয়াল নিয়ে কারও গর্দান কাটতে যাচ্ছি না। সংখ্যাধিক্য বলে কাউকে দমিয়ে রাখার চেষ্টাও করছি না।’

— প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, ২২ জানুয়ারি, ২০২৪

সত্যের একটা অদ্ভুত শক্তি আছে যে আপনি যতই লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করুন না কেন, যতই অবদমিত করে রাখার চেষ্টা করে থাকুন না কেন, এর প্রকাশ একদিন না একদিন সুদ আসল-সহ পরমগ্রাহ্যরূপে চতুর্দিক আলোকিত করবেই। এরকমভাবেই জ্ঞানবাপীর পরম সত্য এখন বাইরে বেরিয়ে পড়েছে। জ্ঞানবাপী এমনই এক সত্য যা এই ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর প্রতিটা হিন্দুর মনের মণিকোঠায় বিন্দু বিন্দু করে লুক্কায়িত আছে। কেবলমাত্র এই দেশের মুসলমান ও সেকুলারবাদীদের কাছে এই সত্যের সন্ধান ছিল না অথবা ছিল কিন্তু তা স্বীকার করার মতো সৎসাহস ছিল না। এখনোও নেই। এর একটাই কারণ হতে পারে সেটা হচ্ছে, সত্য স্বীকার করে নিলেই এদের মনে হতে পারে যে তারা সর্বস্ব হারিয়ে বসে আছে।

যখনই আমরা অযোধ্যা, মথুরা, কাশী এবং হাজার হাজার মন্দির ধ্বংসের কথা বলি, বহিরাগত আক্রমণকারীদের দ্বারা আমাদের সভ্যতা, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের গৌরব বারবার আক্রান্ত হয়েছে, আমাদের মন্দিরগুলোকে ধ্বংস করে দিয়ে তার মাথায় মসজিদ বানানো হয়েছে অথবা একেবারে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে, তখন একটাই কথা মনে হয় যে এই সনাতন সভ্যতা সংস্কৃতি ক্রমশ সংকুচিত হতে থাকা বা ক্রমশ ধ্বংস হতে থাকা একটা ক্ষতবিক্ষত সভ্যতা। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার সময়কালেই এই মানসিকতার সমাপ্তি হতে পারত।

সেই সময় শাসনকার্য পরিচালনায় যে সরকার ছিল তাদের যদি ভবিষ্যতের দৃষ্টিভঙ্গি পরিস্কার থাকত, বিন্দুমাত্র যদি সনাতন সভ্যতার আলোকে আলোকিত থাকতেন, যদি অতীত ইতিহাসের দিকে তাকাতেন, অতীতে এই সনাতন সংস্কৃতির প্রতি যে অন্যায় হয়েছে তার বিন্দুমাত্র প্রতিকার করার মানসিকতা থাকত, তাহলে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পরই এই সমস্যার এক সর্বগ্রহণযোগ্য সমাধান তাঁরা করে ফেলতে পারতেন।

এটা আমরা বলতে চাইছি না যে অতীতে যত মন্দির ধ্বংস হয়েছে এখন সব মন্দিরকে ধরে ধরে আগের রূপ ফিরিয়ে আনতে হবে। কিন্তু এই সংস্কৃতির আত্মাস্বরূপ তিনটি মন্দিরকে পুর্ণমর্যাদা সহকারে তার অতীত ঐতিহ্য-সহ হিন্দুদের কাছে ফিরে আসা খুব জরুরি। অযোধ্যায় শ্রীরামমন্দির, মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ জন্মস্থান মন্দির এবং বারাণসীতে বাবা বিশ্বনাথের মন্দির— কেবলমাত্র এই তিনটি মন্দির ফিরে পেতে চাইছে।

একথা না মুসলমানরা শুনেছে, আর না ওদের সঙ্গে যোগ দেওয়া, তোল্লা দেওয়া সেকুলারবাদীরা শুনতে চেয়েছে। অথবা শুনতে পেয়েছে কিন্তু আমল দিতে চায়নি। যারা শাসনকার্য পরিচালনা করেছে তারাও শুনতে চায়নি। কিন্তু এর পরিণামে আজ যা কিছু হচ্ছে তা তাদের অদূরদর্শিতার কারণেই হচ্ছে। যদি ১৯৪৭ সালেই এই তিনটি মন্দিরের বিষয়ে মীমাংসা হয়ে যেত তাহলে পরবর্তীকালে আর এই বিষয় নিয়ে আর কথা উঠতো না। কিন্তু তিনটে মন্দিরের কথা মানা তো দূরের কথা, হিন্দুদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য সংবিধান সংশোধন করে এমন আইন প্রণয়ন করা হলো যাতে হিন্দুরা এই তিনটি মন্দির-সহ অন্যান্য মন্দিরগুলি পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য আদালতে আবেদন পর্যন্ত না করতে পারে। ১৯৯১ সালে যখন Places of Worship Act আনা হয় তখন নিশ্চিত করা হয় যে ১৯৪৭ সালে যে সমস্ত ধর্মস্থানের যা স্থিতি আছে সেই স্থিতি বজায় রাখতে হবে। নতুন করে আর মামলা-মোকদ্দমা দায়ের করা যাবে না। যদি এই আইন সবার জন্য সমানভাবে প্রযুক্ত হতো তাহলে একটা কথা ছিল, কিন্তু কেবলমাত্র হিন্দুদের জন্যই এই আইন করা হয়েছিল।

সত্যি বলতে কী, কোনো এক ধর্মে বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে এরকম আইন পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোথাও হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। সংসদে এই আইন পাশ হয়েছে। কংগ্রেস ওই সময় শাসনক্ষমতায় ছিল এবং পি ভি নরসিমারাও প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। অযোধ্যার আন্দোলনও একই সময়ে চলছিল। সেই আন্দোলনের কারণে নয়, মুসলমান নেতাদের চাপের কারণে এই সিদ্ধান্ত কংগ্রেস সরকার নিতে বাধ্য হয়েছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল যে অযোধ্যা আন্দোলন যে গতিতে এগোচ্ছে তাতে রামজন্মভূমি তাদের হাত

থেকে বেরিয়েই গেছে। আর কোনো মসজিদ যাতে তাদের হাত থেকে বেরিয়ে না যায় তার জন্য এই ধরনের একটা আইন তৈরি করার জন্য কংগ্রেস সরকারের ওপর মুসলমান নেতারা অত্যধিক চাপ তৈরি করেছিল এবং তারই ফলশ্রুতি ছিল এই Places of Worship Act 1991। এই আইনের সাহায্যে বাকি হিন্দু ধর্মস্থানের ওপর নিয়ন্ত্রণ আনার চেষ্টা সরকার তখন করেছিল।

সম্ভবত ২২ মে ২০২২, এই দিনটিকে ভারতবর্ষের ইতিহাসে, সুপ্রিমকোর্টের ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক দিন হিসেবে মনে করা যেতে পারে। কারণ ওইদিন বিচারপতি চন্দ্রচূড় তখন তিনি প্রধান বিচারপতি হননি এক ঐতিহাসিক রায়ে যা বলেছিলেন, তা আগামী দিনগুলোতে ক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করেছে।

1991 Places of Worship Act-এর ব্যাপারে তিনি কোনো টিপ্পনী করেননি। এই আইন জ্ঞানবাপী মন্দিরের ব্যাপারে সম্পর্কিত হবে কী হবে না, এই ব্যাপারে এই মামলা এখনো চলছে। কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে যে হলফনামা দাবি করা হয়েছিল সেই হলফনামা এখনো পৌঁছয়নি, তাই এই মামলা এখনো চলছে। উনি বলেছেন যে Places of Worship Act-এ ১৯৪৭-এর স্থিতি বজায় রাখার জন্য বলা হয়েছে এ ব্যাপারে তাঁর কিছু বলার নেই কিন্তু, এই কিন্তু শব্দটির মধ্যে পরবর্তীকালে তিনি যে শব্দগুলি প্রয়োগ করেছেন তাহলো Places of Worship Act, 1991 সেই জিনিসটাকে নিবৃত্ত করতে পারে না যা কোনো ধর্মস্থলের প্রকৃত স্বরূপ কী ছিল তা নির্ধারণ করতে বাধা দেয় বা বন্ধ করতে পারে।

আমাদের জানতে হবে যে ওই সময় ওই ধর্মস্থলের প্রকৃত স্বরূপ কী ছিল? এই স্বরূপ নির্ধারণের জন্যই জ্ঞানবাপীর সার্ভে করার নির্দেশ উনি দিয়েছিলেন। জেলা জজ আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার তত্ত্বাবধানে সার্ভে করার নির্দেশ জারি করেন।

এই সার্ভে বন্ধ করার জন্য প্রচুর চেষ্টা হয়েছিল। জেলা আদালত থেকে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত চেষ্টা হয়েছিল। সার্ভের রিপোর্ট যাতে জমা না পরে তার জন্য চেষ্টা হয়েছে। রিপোর্ট জমা হওয়ার পরেও এই রিপোর্ট যাতে বাইরে না বেরিয়ে আসে সেই চেষ্টা করা হয়েছে। এই রিপোর্ট প্রকাশ না করার জন্য বার বার চেষ্টা হলো। কিন্তু রিপোর্ট প্রকাশে এসেছে এবং সত্যের উন্মোচন হয়েছে।

৮৩৯ পাতার রিপোর্টের কপি দিয়ে দেওয়া হয়েছে সব পক্ষকে। এই ব্যাপারে হিন্দু পক্ষের উকিল রিপোর্ট বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে সমস্ত শিলালেখ তথাকথিত মসজিদের দেওয়ালে পাওয়া গেছে, সেগুলি চিৎকার করে বলছে— এটা মন্দির, এটা মন্দির, এটা মন্দির। ওই মন্দিরের চূড়াটুকু ভেঙে ফেলে তার উপরে শুধু মসজিদের কাঠামোটা করে দেওয়া হয়েছে, তার প্রমাণ তো ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায়। এটি শ্রীভগবান শঙ্করের মন্দির। এটাও লেখা আছে আওরঙ্গজেব এটাকে ধ্বংস করেছিল। ইতিহাসে এটাও লেখা আছে যে আওরঙ্গজেব এটাকে ভাঙার জন্য হুকুমনামা জারি করেছিল। সেই হুকুমনামায় হস্তাক্ষরকারীর নাম আছে যেটাতে পরিষ্কার এই আদেশ দেওয়া আছে যে মন্দির ভেঙে মসজিদ করা হয়েছিল। এবার আপনারা এই দেশের দুর্ভাগ্য দেখুন কীরকম। ঔরঙ্গজেবের পাশবিক প্রবৃত্তিকে ধরে রাখার জন্য এই দেশে প্রচুর লোকের জন্ম হয়েছে। কিন্তু বাবা বিশ্বনাথের জন্য লোকের বড়োই অভাব। বিগত ৫০ বছর ধরে এই কুনাট্য চলেছে।

এখানে পাওয়া শিবলিঙ্গ যার মাথায় ড্রিল করে ফোয়ারা পর্যন্ত বানানোর চেষ্টা করেছে আওরঙ্গজেবের পক্ষের লোকেরা। কিন্তু তা এত শক্ত যে পুরোপুরিভাবে নষ্ট করতে পারেনি। শিলালেখগুলো ভেঙে ফেলার কৌশল করা হয়েছে কিন্তু কোনোটাই ভালোভাবে করতে পারেনি। আপনারা কাশী বিশ্বনাথ মন্দির গিয়ে থাকলে বাইরের কারুকার্য দেখে আপনাদের পরিষ্কার মনে হবে যে এরা চিৎকার করে করে বলছে— আমি মসজিদ নই, আমি মন্দির। নন্দী শুধু ভারতবর্ষে নয়, গোটা পৃথিবীতে যেখানে যেখানে শিবের মন্দির আছে সেখানে শিবের দিকে তাকিয়ে থাকে, আর কাশীতে রয়েছে উলটোদিকে। নন্দী মসজিদের দিকে মুখ করে বসে আছে। নন্দী মন্দিরের দিকে তাকিয়ে থাকে তা যে আমাদের সংস্কৃতির মধ্যে আছে তারা জানত না, জানলে নন্দীকে ভেঙে উলটো দিকে করে দিত। এটা পরিষ্কার যে জ্ঞানবাপী মন্দির ছিল, মন্দির আছে এবং ভবিষ্যতে আবারও মন্দির হতে চলেছে।

এই রিপোর্ট এসেছে। তা প্রকাশ্য হয়েছে কিন্তু এস আই রিপোর্টকে রামজন্মভূমি আন্দোলনে মামলায় ইনক্লুসিভ এভিডেন্স হিসেবে নেওয়া হয়নি, অন্যান্য প্রমাণের সঙ্গে মিলিয়ে এটাকে ধরা হয়েছে। জ্ঞানবাপী সমীক্ষায় এসআই-এর যে রিপোর্ট এসেছে তারপর এটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে এর পরবর্তীকালে আর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হবে না। এটা পরিষ্কার যে ওটা শিবমন্দির এবং এর চূড়াটি শুধু ভেঙে দিয়ে তার উপর তিনটে গম্বুজ তৈরি করা হয়েছে। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির তৈরি হয়ে গেছে, সেখানে মূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে। জ্ঞানবাপীর সময় এসে গেছে, তারপরে মথুরার সময় আসবে।

এই তিনটি ধর্মস্থল ভারতবর্ষের হিন্দুদের কাছে আত্মাস্বরূপ। এগুলি ছিনিয়ে নিয়ে তা দলিত করা, পদদলিত করা এবং পরিবর্তিত করার চেষ্টা দীর্ঘদিন ধরে করা হয়েছে।

এবার লক্ষ্য করুন এখন যা কিছু হচ্ছে তা নতুন ভারতে হচ্ছে। ১৯৪৭ সালে করা যায়নি। তখন কি নেতার অভাব ছিল? বড়ো বড়ো লোক ছিল। কংগ্রেস ছিল। সাধুসন্তরা ছিলেন। কিন্তু এটা করা যায়নি।

কেন বর্তমান সময়ের জন্য ভারতবর্ষের সন্তানেরা অপেক্ষা করে ছিলেন? একজন যোগ্য প্রধানমন্ত্রীর জন্য অপেক্ষা করে ছিলেন যিনি এই তিনটি ধর্মস্থান পুনরুদ্ধার করার জন্য চেষ্টা করবেন। এখন কোনো মুশকিল, কোনো অন্য বাধা সামনে আসতে পারে না।

অযোধ্যায় ৫০০ বছর সংঘর্ষের পরে মন্দির তৈরি হয়েছে। এখন মনে হচ্ছে যে জিনিসটা কত সহজ ছিল। এত সহজ জিনিসটা ৫০০ বছর ধরে আটকে ছিল। আজ যে কাজটা আমাদের এত সহজ লাগছে তারজন্য ৫০০ বছর ধরে কত বলিদান কত সংঘর্ষ হয়েছে। এখন দেখে মনে হচ্ছে যে জিনিসটা কত সহজ ছিল এবং কত সহজে এটা সমাধান করা যেত।

এই দেরি হওয়ার পিছনে আমি সবসময় মনে করি যে মুসলমানরা এই দেরির কারণ নয়। আসলে দেরির কারণ আমাদের হিন্দুধর্মের বেশ কিছু লোক যারা সব সময় অন্য ধর্মের লোকদের ভুল বুঝিয়েছে এবং পুরো জিনিসটার মধ্যে রাজনীতি এনেছে। আর এই কাজ বারবার করার চেষ্টা করেছে। চেষ্টা করে গেছে ভগবান শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ ও

শঙ্কর মহাদেবকে নির্দিষ্ট জাতির মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতে। এর থেকে বড়ো পাপকাজ পৃথিবীর ইতিহাসে হয়েছে বলে আমার জানা নেই। কিন্তু তাদের কোনো সমস্ত প্রচেষ্টাই ফলপ্রসূ হয়নি।

এ জন্য আমার মনে হয়েছে যে এই সমস্ত লোকের জীবনে দুর্বিষহ দিন আসতে চলেছে। সনাতন ধর্মকে হেয় করার জন্য, আমাদের সংস্কৃতিকে হেয় করার জন্য, অসম্মান করার জন্য এদের দীর্ঘদিনের সব কারসাজি আজ বিফল হয়েছে। এর একমাত্র কারণ কিছু শতাংশ হিন্দু দারুণভাবে জেগে উঠেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের হিসেবে ৩৫ থেকে ৩৬ শতাংশ হিন্দু জাগ্রত। এই হিসাব যদি আর একটু বাড়ে তাহলে এই কুচক্রীদের কোথায় স্থান হবে ভেবে দেখুন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের একশো বছরের তপস্যার ফল এখন ফলতে শুরু করেছে।

শুধুমাত্র এইটুকু বোঝার বিষয় নয় যে অযোধ্যায় শ্রীরামচন্দ্রের ভব্য মূর্তি তৈরি হয়ে গেছে। জ্ঞানবাপী মুক্ত হবে এবং ওখানে নতুন করে আবার ভগবান শ্রীশঙ্করের মন্দির তৈরি হবে। শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানেও মন্দির তৈরি হবে। ভাবনা শুধু এইটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সত্যকথা হলো যে সত্যকে কখনোই চেপে রাখা যায় না। তার স্বরূপ উন্মোচিত হবেই।

যে সমস্ত লোক এই সত্যকে চেপে রাখার জন্য, লুকিয়ে রাখার জন্য, পরিবর্তিত করে দেওয়ার জন্য দীর্ঘদিন ধরে সজ্ঞানে চেষ্টা করে গেছে তারা আজকে উন্মুক্ত হয়ে গেছে। এই ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত এই মানুষগুলি সমাজের শত্রু। হিন্দু হলেও তারা শত্রু। এদের চিনতে শেখা দরকার।

যে সমস্ত ইতিহাসবিদ সনাতন সভ্যতাকে ঘায়েল সভ্যতা বলেছেন, তারা এই কারণেই বলেছে যে হাজার হাজার মন্দির ভেঙে মসজিদ তৈরি করা হয়েছে এবং দীর্ঘদিন এই সত্যকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে এবং স্বাধীতার পরও তার প্রতিকার করা হয়নি। কিন্তু এখন তারা মত পরিবর্তন করতে শুরু করেছেন।

ইসলামি শাসন থেকে শুরু করে ইংরেজ আমল পর্যন্ত আমাদের দেশে বিভিন্ন মন্দিরের মূর্তি ভেঙে ফেলা হয়েছে, বিভিন্ন মন্দির মসজিদে পরিবর্তন করা হয়েছে । যেভাবে ইংরেজ ও মুসলমান শাসনে মন্দির ভাঙা হয়েছে, তাতে আমাদের সমাজের মধ্যে একটা সুগভীর ক্ষত তৈরি হয়ে আছে। গভীর এই ক্ষতের উপর প্রথম মলম লাগানোর কাজ শুরু হয়েছে শ্রী রামচন্দ্রের ভব্য মন্দির নির্মাণের মধ্য দিয়ে। এবং এটা ধারাবাহিকভাবে এখন চলবে।

শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির নির্মাণ, জ্ঞানবাপী মন্দির নির্মাণ এবং মথুরায় মন্দির নির্মাণ ইতিহাসের প্রায়শ্চিত্ত বলা যেতে পারে। এগুলি ইতিহাসের ভুলের সংশোধন করার প্রয়াস। কারুর উপর অত্যাচার করে কাউকে দাবিয়ে রাখার বিষয় নয়। অথবা কাউকে দুর্বল দেখানোর বিষয় নয়। প্রধানমন্ত্রী ২২ জানুয়ারি বলেছেন যে, আজ বিজয়ের সময় নয়, আজ বিনয়ের সময়। এগুলি আমরা কারোর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছি না। দেশের আইন কানুন এবং সংবিধানসম্মত উপায়ে তা আমাদের কাছে ফিরে আসছে। আমরা তরোয়াল নিয়ে কারও গর্দান কাটতে যাচ্ছি না। সংখ্যাধিক্য বলে কাউকে দমিয়ে রাখার চেষ্টাও করছি না।

আইনের রাস্তায় হেঁটে আমরা এই তিনটি মন্দির আমাদের মতো করে পাওয়ার চেষ্টা করছি। আগামী দিনগুলোতে আরও অনেক বড়ো বদল আপনারা দেখতে পাবেন তার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করুন। আমাদের সবাইকে এক প্রদীপ থেকে আর এক প্রদীপ জ্বালাতে হবে। আমাদের সংস্পর্শে যারা আসবে তাদের মধ্যে এই সনাতনী স্পর্শ দেবার চেষ্টা করতে হবে। প্রতিটি ভারতবাসীকে এই আনন্দের ভাগীদার হওয়ার জন্য আমাদের সকলকে চেষ্টা করে যেতে হবে।

(লেখক আজ কা আখবারের সম্পাদক)

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তর বীরভূম জেলার মহেশ্বর খণ্ড কার্যবাহ গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জির পিতৃদেব সত্যনারায়ণ চ্যাটার্জি গত ১৬ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ হছর। তিনি ১ পুত্র, ১ কন্যা ও ১ নাতি রেখে গেছেন।

* * *

উত্তর বীরভূম জেলার মহেশ্বরপুর খণ্ডের বড়গেছিয়া শাখার স্বয়ংসেবক তথা দক্ষিণ নদীয়া জেলা প্রচারক সুশোভন মণ্ডলের ঠাকুমা গত ১৩ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। তিনি ৩ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

দক্ষিণ বীরভূম জেলার রাজনগর খণ্ডের কানমুড়া শাখার স্বয়ংসেবক তথা মুর্শিদাবাদ বিভাগ প্রচারক সুদীপ সিংহের ঠাকুরদা রোহিত কুমার সিংহ গত ১১ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৮ বছর। তিনি ১ পুত্র ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

উত্তর বীরভূম জেলার মহারাজা নন্দকুমার খণ্ডের বেড়াশিমুল শাখার স্বয়ংসেবক তথা কাঁথি জেলা প্রচারক ভীষ্মদেব মণ্ডলের মাতৃদেবী গত ২৩ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তিনি ৫ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

উত্তর বীরভূম জেলার মহারাজা নন্দকুমার খণ্ডের সহ-কার্যবাহ বাপী মণ্ডলের পিতৃদেব প্রহ্লাদ মণ্ডল গত ২৩ জানুয়ারি পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। তিনি ২ পুত্র ও ২ নাতনি রেখে গেছেন।

* * *

মালদহ নগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক দীনেশ চন্দ্র বসাকের সহধর্মিণী গীতা বসাক গত ১ ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। তিনি তাঁর স্বামী ও ২ কন্যা রেখে গেছেন।

* * *

মালদহ নগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক বিভাষ রঞ্জন ঘোষ গত ২ ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ১ পুত্র ও ১ কন্যা রেখে গেছেন।

* * *

দক্ষিণ কলকাতার প্রবীণ স্বয়ংসেবক বিজয় চক্রবর্তী গত ৩১ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। তিনি মূলত কলকাতা মেডিক্যাল শাখার স্বয়ংসেবক। পরে দক্ষিণ পুঁটিয়ারিতে বসবাস শুরু করেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কার্যবাহ, কলকাতা অতি দক্ষিণ ভাগের একটি নগরের সঙ্ঘচালকগ এবং পরে অতি দক্ষিণ ভাগ সঙ্ঘচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

সরস্বতীপূজা শুধু সরস্বতী আরাধনা দিবস, অন্য কিছু নয়

হিন্দু ধর্মকে আফিং বলা বাম নেতা জ্যোতি বসু থেকে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কী সুকৌশল হলে হিন্দুর শ্রদ্ধার কেন্দ্রগুলিকে বাঙ্গালির মন থেকে মুছে দিতে চেষ্টা করেছিলেন তা যদি পর্যালোচনা করা যায়, তাহলে দেখা যাবে তা যেন ব্রিটিশ আমলের 'মেকলে' নীতিরই রেপ্লিকা।

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী

বেশ ক'বছর আগেকার কথা। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কয়েকজন বিশিষ্ট কার্যকর্তা সেদিন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালামের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। কয়েকজন সাংবাদিকও ছিলেন তাঁদের সঙ্গে। তাঁরা দেখেন রাষ্ট্রপতির বৈঠকখানায় এক বিরাট সরস্বতীর মূর্তি। সাংবাদিকরা তো অবাক। কালাম সাহেব উপাসনা পদ্ধতিতে মুসলমান। ইসলামে মূর্তিপূজা নিষিদ্ধ। অথচ তাঁর ঘরে মা সরস্বতীর মূর্তি। কৌতূহল চাপতে না পেরে এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেই বসলেন, ''স্যার আপনার ঘরে সরস্বতীর মূর্তি''? মুচকি হেসে কালাম সাহেব বললেন, ''আমি বিজ্ঞানী, বিদ্যার সাধক। আমার ঘরে বিদ্যাদেবী সরস্বতী মূর্তি থাকবে না তো কার মূর্তি থাকবে!''

আমাদের ছোটোবেলায় স্কুলে স্কুলে সরস্বতী পুজোর কী আনন্দটাই না ছিল। আগেরদিন রাত জেগে প্যান্ডেল সাজানো, পূজার জোগাড়, না বলে কারও বাড়ি থেকে ফুল নিয়ে আসা, ডাব পেড়ে খাওয়া, পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া, বন্ধুদের সঙ্গে প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ঘোরা কত কী। সেসব আজ ইতিহাস। এর মাঝে গঙ্গা দিয়ে গড়িয়ে গেছে অনেক জল। ভোটসর্বস্ব রাজনীতিতে আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গের স্কুল-কলেজে সরস্বতীর আরাধনা ধীরে ধীরে তার কৌলিন্য হারিয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পূজা তো বন্ধ হওয়ার মুখেও। বাকি যেগুলি চলছে তা নিতান্তই যেন নিয়ম রক্ষার জন্য। বছর কয়েক আগে বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলায় স্কুল অডিটে গিয়েছিলাম। যে স্কুলগুলিতে দু'তিন বছর আগে পর্যন্ত সরস্বতী পুজোর খরচ হিসাবের খাতায় লেখা থাকতো সেগুলি কোনো কারণে অদৃশ্য ছিল। কারণ জিজ্ঞেস করতে প্রধান শিক্ষক বলেছিলেন আসলে স্কুলে তো এখন ৬০-৭০ শতাংশ মুসলমান ছাত্র-ছাত্রী। তারা সরস্বতী পুজোয় চাঁদা দিতে আগ্রহী নয়। তাদের চাপে স্কুলে সরস্বতী পুজো বন্ধ হয়ে গেছে, এখন মুসলমান অভিভাবকদের চাপে স্কুলে 'বিশ্ব নাবী দিবস' (হযরত মুহাম্মদের জন্মদিন) পালনের দাবি উঠতে শুরু করেছে।

> **হিন্দুর দেবদেবীকে অসম্মান করা এবং ধীরে ধীরে ভুলিয়ে দেওয়ার যে চক্রান্ত তা আজ নয়, ৫০ বছর আগে বামপন্থীদের সময়েই শুরু হয়েছিল।**

ঠিক তার পরের বছর ২০১৭-র জানুয়ারিতে হাতেগরম উদাহরণ পেয়ে গেলাম হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়াতে। 'সরস্বতী পুজো করলে নবী দিবস পালন করতে দিতে হবে'— এই দাবিকে কেন্দ্র করে তেহট্ট হাইস্কুলে যখন ঝামেলা হলো, সরস্বতী পুজার দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রীদের উপর পুলিশ নির্বিচারে লাঠি চালাল। লাঠির ঘায়ে নবম শ্রেণীর হিন্দু ছাত্রীর মাথা ফাটল। শেষ পর্যন্ত স্কুলে জোর করে সরস্বতী পূজা বন্ধ করে দেওয়া হলো। তখন আমার ধারণাটি আরও পরিষ্কার হয়ে গেল। বুঝলাম মুসলমান সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশ এদেশে মা সরস্বতীর সাধক আবদুল কালাম তৈরি করতে চায় না, চায় সন্ত্রাসবাদী আজমল কাসব তৈরি করতে। মা সরস্বতীর সাধনা তাদের কাছে পসন্দ নয়। আর বিরিয়ানি বার্গারে মজে থাকা হিন্দু

ফঃ ২

বাঙ্গালিও এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে সময় নষ্ট করতে রাজি নয়। তাই এরাজ্যে স্কুলে কলেজে সরস্বতীর আরাধনা প্রায় বন্ধ হওয়ার মুখে। আর যেটুকু বেঁচে রয়েছে তা মায়ের সারস্বত সাধনা হিসেবে নয়, ফুর্তি-মস্তি-ডিজে- ড্যান্সের মাধ্যম হিসাবে। গভীরভাবে দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে এ হলো এরাজ্যে সুদীর্ঘ ৩৫ বছরের বাম অপশাসনের বিষময় ফল। এদের রাজত্বে হিন্দু বাঙ্গালির একটা বড়ো অংশের মধ্যে দেব-দেবীর প্রতি তৈরি হয়েছে গভীর অশ্রদ্ধা ও বিরূপতা। এ এক গভীর ষড়যন্ত্র। হিন্দু ধর্মকে আফিং বলা বাম নেতা জ্যোতি বসু থেকে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কী সুকৌশলে হিন্দুর শ্রদ্ধার কেন্দ্রবিন্দুগুলিকে বাঙ্গালির মন থেকে মুছে দিতে চেষ্টা করেছিলেন তা যদি পর্যালোচনা করা যায়, তাহলে দেখা যাবে তা যেন ব্রিটিশ আমলের 'মেকলে' নীতিরই রেপ্লিকা। আর এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সরকারি উচ্ছিষ্ট পুষ্ট সংবাদপত্র ও প্রচারমাধ্যমগুলি। একটি উদাহরণ দিলে আমার এই কথার সারবত্তা প্রমাণ হয়ে যাবে।

সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় শ্লীল-অশ্লীল বহু রকমের সাহিত্য রচনা করে জ্যোতি বসুর আমলে বিখ্যাত হয়ে গেলেন। জ্যোতিবাবুর পরে এল বুদ্ধ রিজিম। সিপিএম সুনীলবাবুকে মাথায় তুলে ধেই ধেই করে নেত্য শুরু করল। এরাজ্যে বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরতের থেকেও সুনীল 'কুলীন' সাহিত্যিক— এই প্রচার শুরু হলো। সরকারি উচ্ছিষ্টপুষ্ট প্রচারমাধ্যমও সুনীলবাবুকে বাঙ্গালির সর্বকালের সেরা সাহিত্যিক বানিয়ে ছাড়ল। ৭ এপ্রিল ২০০৬ দিল্লির ন্যাশনাল মিউজিয়াম সভার ঘরে কে কে বিড়লা ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে বিচারপতি গোপাল পট্টনায়ক ২০০৪-০৫ সালের সরস্বতী সম্মান তুলে দিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতে। এ বাঙ্গালির এক চরম প্রাপ্তি! খুশির খবর, তাই না? এতে তো আমাদের গর্ব হওয়ার কথা! হলোও তাই। বাম সরকার সুনীলবাবুকে নামে যশে ভরিয়ে দিল। সুনীলবাবুই হয়ে উঠলেন কবি সুকান্তর ভ্রাতুষ্পুত্র সাহিত্যমনস্ক মুখ্যমন্ত্রীর ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর। এ পর্যন্ত ঠিকই ছিল। কিন্তু তাল কাটলো ভারত-তিব্বত সীমান্তরক্ষী বাহিনীর প্রাক্তন নির্দেশক বিভূতিভূষণ নন্দী যখন সুনীল বাবুর বিরুদ্ধে কলকাতা কোর্টে মামলা করলেন। বললেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তার আত্মকথা উপনাসে হিন্দু মানসে আঘাত করেছে। অতএব সেই বইটি নিষিদ্ধ করা হোক। প্রকাশ্যে এল মা সরস্বতীকে নিয়ে বামপন্থী সুনীলবাবুর নোংরামো, যা ১৯০৫ সালের ২৮ মার্চ আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আত্মকথা'য় প্রকাশিত হয়েছিল (৮৪ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, সোমবার, ১৪ চৈত্র, ১৪১১, কলকাতা)।

লেখার হেডিং 'বরপুত্র'। হুবহু তুলে দিচ্ছি, পাঠকরাই বিচার করুন এ নান্দনিক শিল্প, না বিকৃত পাশবিক প্রবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ। সরস্বতী পুরস্কারে ভূষিত সুনীলবাবুর মা সরস্বতীর প্রতি তার জীবনের কৈশোর থেকে কেমন শ্রদ্ধা ছিল। সুনীলবাবু লিখছেন, ''বহু অর্চনা করেছি তোমায় / এখন ইচ্ছে টেনে চোখ মারি / হে বীণাবাদিনী তুমিও তো নারী / ক্ষমা করো এই বাক ব্যবহার....।' ক্ষমা করেছিলেন? এতো বহু পরের ঘটনা। আগেরটা এবার সরস্বতী পুজোর পূর্বলগ্ন। ''নিঃশব্দ নিবিড় রাত্রি, আমি বসে আছি, আমার সামনে একটি মাটির মূর্তি ছাড়া আর কিছু নেই। এক সময় সর্বাঙ্গে শিহরণ হল। কি অপূর্ব সুন্দর মুখ এই শ্বেতবাসনা রমণীর। আয়ত চক্ষু, ফুরিত ওষ্ঠ, ভরাট বর্তুল দুটি স্তন। সরু কোমর, প্রশস্ত হৃদয়, ...তছনছ হয়ে যেতে লাগলো আমার কৈশোর, জেগে উঠলো পুরুষার্থ, অল্প শীতেও উষ্ণ হয়ে উঠল শরীর। .....চোরের মতন সতর্কভাবে একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে আমি হাত রাখলাম দেবী মূর্তির বুকে। জয় জয় দেবী চরাচর সারে, কুচযুগ শোভিত মুক্তাহারে.....' সেই কুচযুগে আমার আঙ্গুল, আমার শরীর আরো রোমাঞ্চিত হলো, কান দুটিতে আগুনের আঁচ। আমি প্রতিমার ওষ্ঠ চুম্বন করলাম, আমার জীবনের প্রথম চুম্বন''।

কী মনে হচ্ছে? ইনি মানুষ, না মানুষ্য অবয়বে কোনো পশুজাত? পশুসমাজে মা-বোনের বাছবিচার নেই জানি, কিন্তু ইনি তো তা নন। তবে কেন এমন হলো? আসলে ইনি ছিলেন পশুরও অধম, বামমনস্ক। মনুষ্যমাতার জঠরে লালিত, পোষিত পশুবিশেষ। এই ছিলেন আমাদের সুনীল, আর এই ছিল আমাদের বামপন্থীরা! কলকাতা বইমেলায় আনন্দ পাবলিশার্সের চকচকে মলাটে সর্বাধিক দামে বিকৃত বইয়ের মধ্যে সুনীল বাবুর বইও তালিকার প্রথম দিকেই থাকে। এদেরই বদান্যতায় বাঙ্গালির দেরাজ খুললে আজও সুনীলবাবুদের দু-চারটি লেখা বই চোখে পড়বেই। আমাদের জানা উচিত হিন্দুর দেবদেবীকে অসম্মান করা এবং ধীরে ধীরে ভুলিয়ে দেওয়ার যে চক্রান্ত তা আজ নয়, ৫০ বছর আগে বামপন্থীদের সময়েই শুরু হয়েছিল।

বাঙ্গালি হিন্দুদের মনে রাখতে হবে, সরস্বতীপূজা শুধু সরস্বতী আরাধনার দিন, অন্য কিছু নয়। জ্ঞানর্জনের লক্ষ্যে শুধু বিদ্যার প্রতি নিষ্ঠা, বিদ্যার প্রতি প্রেম। □

With Best Compliments from -

A Well wisher

ঔপনিবেশিক ১৪ ফেব্রুয়ারি অতিক্রম করবো কীভাবে?

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

গোলাপ দিয়ে ১৪ ফেব্রুয়ারি নয়, অশোক-পরশে ১লা ফাগুন হবে আমাদের প্রেমের দিবস। ভারতবর্ষ প্রেমের উৎসব আদি-অনন্তকাল ধরে পালন করে এসেছে, পালন করেছে ফাগুনের অশোক রঙের নেশায়। ভ্যালেনটাইন'স ডে আমাদের কাছে তাই দেশীয়-সংস্কৃতি- ভোলানো পাশ্চাত্য-মদিরা।

একদিন আমাদের যৌবন চাঞ্চল্য নিয়ে এসেছিল অশোক রাঙিয়ে— অদ্ভুত আনন্দে বেড়া ভেঙেছি, ঝঞ্ঝায় বাঁধন ছিন্ন করে দিয়েছি, জীবনযুদ্ধে মরণপণ লড়তে প্রেরণা পেয়েছি। আমাদের সেই পুরনো দিনগুলি আবারও ফিরিয়ে দিক অশোক মঞ্জরীর পুষ্পার্ঘ্য।

'আমরা নূতন যৌবনেরই দূত।
আমরা চঞ্চল, আমরা অদ্ভুত।
আমরা বেড়া ভাঙি,
আমরা অশোকবনের রাঙা নেশায় রাঙি,
ঝঞ্ঝার বন্ধন ছিন্ন করে দিই— আমরা বিদ্যুৎ।।
আমরা করি ভুল—
অগাধ জলে ঝাঁপ দিয়ে যুঝিয়ে পাই কূল।
যেখানে ডাক পড়ে জীবন-মরণ-ঝড়ে আমরা প্রস্তুত।।'

'Rose-Day নয়, অপর-সংস্কৃতি নয়। চাই অশোক-পরশ।' কিন্তু গোলাপ দিবসের জন্য বিশ্বে যে গুণমানে উন্নত গোলাপ প্রয়োজন হবে, রপ্তানিযোগ্য যে গোলাপের চাহিদা রয়েছে, তার নিয়মিত জোগান দিতে ভারতবর্ষের কৃষকেরা অবশ্যই তা চাষ করবেন। এরজন্য বিশ্বব্যাপী বাজার ধরতে ভারত কখনও পিছপা হবে না। কিন্তু সংস্কৃতি পালন যখন আমরা করবো, তখন আপন সৌকর্যে, আপন ঐতিহ্যেই করবো।

অশোকপরশ কেন? রোজ-ডে কেন নয়! কারণ 'সেকালে মেয়েদের পায়ের

ছোঁয়া লেগে ফুল ধরত অশোকে, মুখমদের ছিটে পেলে বকুল উঠত ফুটে, আমার বাগানে সেই কালিদাসের কাল দিয়েছে ধরা' (মালঞ্চ উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)। ভারতীয় সংস্কৃতিতে অশোক ফুল হচ্ছে প্রেমের প্রতীক। কামদেবের পঞ্চশরের অন্যতম শর অশোক মঞ্জরী, যে বাণে বিদ্ধ করা যায় নারী অথবা পুরুষের প্রেম-মনন। অশোকের ফুলের অনবদ্য রং কখনো নিজের মনকে রাঙিয়ে দিয়ে যায়,

'তোমার অশোকে কিংশুকে
অলক্ষ্য রঙ লাগল আমার
অকারণের সুখে।'

ফাগুনের বসন্তে অশোকের ফুল ফোটে। তাই ১লা ফাল্গুন হোক ভারতীয় প্রেমের দিন। অশোক ফুলের আদিনিবাস ভারতবর্ষ। এটি ভারতবর্ষের স্বাভাবিক উদ্ভিদ। ভারতের কুসুমোদ্যানে তার অমল উপস্থিতি।

অশোক গাছের উদ্ভিদবিদ্যাগত নাম *Saraca asoca*, এটি Fabaceae গোত্রের উদ্ভিদ। এরই অন্য নাম হেমাপুষ্প কিংবা মধুপুষ্প। রামায়ণে উল্লেখ আছে, রাবণ সীতাকে হরণ করে অশোক কাননে রেখেছিল, যাতে সীতার হৃদয়ে প্রেমের উদ্রেক ঘটে। হিন্দু বিশ্বাস, অশোক ফুল শোক নাশ করে, তাই এর নাম অশোক। অশোক গুচ্ছ উপহার দিয়ে তাই আমরা প্রেমের জোয়ারে ভাসতে পারি, প্রেমের আনন্দের সঙ্গে দূর হবে যাবতীয় দুঃখ-শোক। প্রেম জয়ী হবে, সফল হবে, চিরস্থায়ী হবে। প্রেমসম্ভোগের কারণে আবির্ভূত সন্তানের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ হবে। তাই তো চৈত্র মাসের শুক্লাষষ্ঠীতে পালিত হয় অশোক ষষ্ঠী। দু'টি দিনই বসন্তের ঋতুতে পড়েছে।

২. বিদেশি শাসন ও বিধর্মী-সংস্কৃতির বিপ্রতীপে সারাবিশ্বে তিনরকম প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে। প্রথম, তার বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভ ও তীব্র অশান্তি সংঘটিত হয়। দ্বিতীয়, পরাণুকরণের ঢল নামে এবং বিধর্মী রাজার ধর্মকে আপন ধর্ম করে তোলার সক্রিয় প্রয়াস চলে। তৃতীয়, বিধর্মী-সংস্কৃতিকে অতিক্রম করতে চাওয়ার স্পর্ধা দেখানোর নীরব ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়া চলে।

খ্রিস্টান-ইংরেজ আমলে ভারতীয় মুসলমানেরা সামরিকভাবে পরাজয়ের পর সর্বতোভাবে বিরোধিতার পথে গিয়ে ক্রমে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং শিক্ষাদীক্ষায় মারাত্মকভাবে পিছিয়ে পড়লো। বিপ্রতীপে ভারতীয় হিন্দুদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ইংরেজদের সঙ্গে প্রাণঢালা মিতালি করলো, তাদের অনুকরণ করলো এবং ইউরোপীয় শিক্ষার সুযোগে এগিয়ে চললো, যার-ই ফলশ্রুতিতে দেখা গেল নবজাগরণ। তৃতীয় যে জাতীয়তাবাদী ধর্মীয়ধারা, যার নেতৃত্বে শ্রীরামকৃষ্ণ-স্বামী বিবেকানন্দ, তারা খ্রিস্টান-সম্পৃক্ত ধর্মীয় ও সংস্কৃতির দিনগুলিকে বেছে বেছে হিন্দুত্ববাদের পরত মাখিয়ে দিলেন, হিন্দুত্বের জয় সাধিত হলো।

১ জানুয়ারি যত না খ্রিস্টীয় উৎসব, তার চাইতেও কল্পতরুর সুগন্ধি আরও প্রকট হচ্ছে। ১৮৮৬ সালের এই দিনটিতেই শ্রীরামকৃষ্ণ কল্পতরু হয়েছিলেন। নিঃশব্দে একটি ধর্মীয় বিপ্লব এনে দিলেন তিনি খ্রিস্টীয় দুনিয়ায়। এর যে কতটা শক্তি, তা আগামীদিনে খ্রিস্ট-সমাজ বুঝতে পারবে, ততদিনে ধর্মনদী ধর্মতলা পেরিয়ে অনেক দূরে বয়ে যাবে।

একইভাবে স্বামী বিবেকানন্দ ২৫ ডিসেম্বরকে অতিক্রম করে কন্যাকুমারীর শেষ শিলায় ধ্যানে বসে (১৮৯২) অখণ্ড ভারত দিবস করে তুললেন, যখন সমগ্র ব্রিটিশ-ভারত যিশুর ভজনায় উৎসব-মুখর। ভাবা যায়! স্বামী বিবেকানন্দ এই কাজটি খুবই চিন্তাভাবনা নিয়েই করেছেন। এর আগেও তার সুচনা দিয়ে গেছেন, এই দিনটিকে তিনি নতুন ভাবে গড়ে তুলবেন। ১৮৮৬ সালেরই ২৪ ডিসেম্বর রাতে ধুনি জ্বালিয়ে সন্ন্যাস নেবার শপথ নিলেন হুগলি জেলার আঁটপুর গ্রামে স্বামী প্রেমানন্দের বাড়িতে। কয়েকজন গুরুভাইকে সঙ্গে করে একটি খ্রিস্ট-ধর্মীয় দিবসকে এককথায় অতিক্রম করে চলে গেলেন তিনি। অন্য দিনও তো ছিল! কই বাছলেন না তো সেইসব দিন! আঁটপুরেও তিনি পৌঁছে গিয়েছিলেন তার আগেই। যতদিন যাবে বিশ্ববাসী দেখতে পাবেন কন্যাকুমারীর পাষাণ শিলার স্বামীজী জীবন্ত হয়ে সীমানা ছাড়িয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছেন। এবং ঘটনাচক্রে ওই দিনটি হবে ২৫ ডিসেম্বরের বড়দিন। কী ব্যতিক্রমী প্রতিস্পর্ধা! বিবেকানন্দ কেন্দ্র ওই দিনটি বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে পাষাণের মধ্যেই স্বামীজীকে বোধন করে খ্রিস্ট-মতকে অতিক্রম করে গেল এক নীরব বিপ্লবের মধ্যে; সম্প্রতি তারই সুবর্ণজয়ন্তী পালিত হয়েছে। একেই বলে সাংস্কৃতিক- জাতীয়তাবোধ। বড়দিন আর ইংরেজি বছরের প্রথমদিনটি যথাক্রমে স্বামীজী ও পরমহংসময় হয়েই থাকবে!

সেভাবেই সেন্ট ভ্যালেন্টাইনের দিনটিকেও অতিক্রম করে সনাতনী পরত মাখিয়ে দিন। কে আছেন সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদী কার্যকর্তা? যে ভালোবাসা চিরন্তন, যে ভালোবাসা হতে পারে নিখাদ, যে ভালোবাসা হতে পারে নিঃস্বার্থ— তাই ১৪ ফেব্রুয়ারি জুড়ে বসুক ভারতবর্ষে, পিতৃমাতৃ পূজন দিবস হিসেবে। আর দেহবাদের ভালোবাসার দিনটি হোক ১লা ফাল্গুন।

১৪ ফেব্রুয়ারিকে আমরা অস্বীকার না করেই দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে পারি বাবা-মা-র স্নেহাশীর্বাদের অকৃত্রিমতা। ভালোবাসার জয় এভাবেই হোক ভারতীয় রীতিতে। বাবা-মা-কে ভালোবাসার দিন, পুত্র-কন্যা, পৌত্র-পৌত্রীকে ভালোবসার দিন হোক ১৪ ফেব্রুয়ারি। ঔপনিবেশিকতার পরাজয় এভাবেই ঘটুক। তার পরই ১লা ফাল্গুন অশোক ফুলের মঞ্জরী দিয়ে পালিত হোক ভারতীয় প্রেমের দিবস, বসন্তোৎসব। □

নেতাজী সুভাষচন্দ্র ছিলেন রামময়

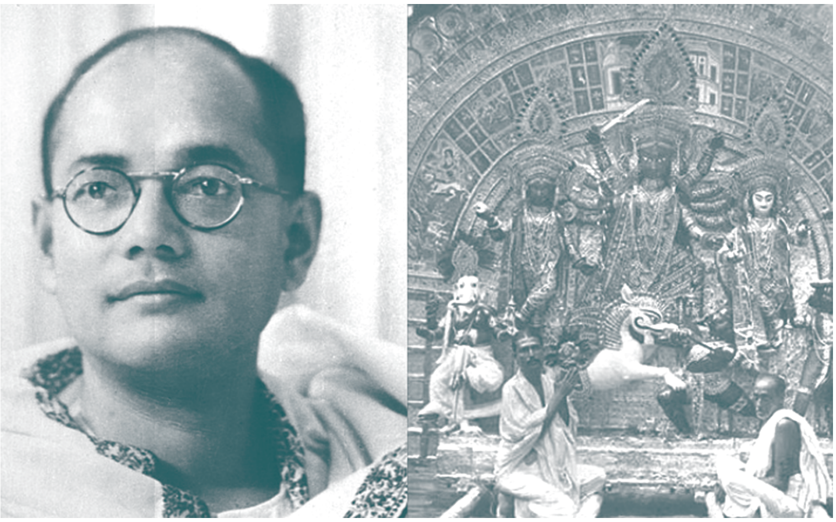

পৃথ্বীশ দাশগুপ্ত

পুরাণ অনুযায়ী বসন্তকাল হলো দেবী দুর্গার প্রকৃত আরাধনার সময়। কিন্তু রাবণ বধের প্রয়োজনে দেবী চণ্ডীর আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য দেবীকে অকাল আবাহন করেছিলেন শ্রীরামচন্দ্র। শ্রীরাম যে দেবী অম্বীকা/চণ্ডীর পূজা করেছিলেন তাঁর ছিল দশটি হাত এবং তিনি ছিলেন মহিষাসুরমর্দিনী। ফলে আমরা যে পূজাকে দুর্গাপূজা বলে জেনে আসছি এবং যে পূজাকে বাঙ্গালির শ্রেষ্ঠ পূজা বলা হয় তা আসলে হলো শ্রীরামচন্দ্রের অকাল বোধন।

বাল্মীকি রচিত মূল সংস্কৃত রামায়ণের সহজবোধ্য পদ্যাকারে ভাবানুবাদ করা কৃত্তিবাসী রামায়ণেও উল্লেখ পাওয়া যায় এই অকালবোধনের। দুর্গাপূজা বাঙ্গালির ধমনীতে বয়ে চলা রক্ত স্রোতের মতো। আর পাঁচটা হিন্দু বাঙ্গালির মতোই শ্রীরামচন্দ্রের করা দেবী দুর্গার পূজারি ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। মা প্রভাবতী দেবীর পূজার্চ্চা ও ধর্মানুরাগ ছেলেবেলা থেকেই প্রভাবিত করেছিল সুভাষকে। নেতাজীর অসমাপ্ত আত্মজীবনী 'ভারত পথিক'-এ তার বাড়ির পূজা সম্বন্ধে লিখেছেন, 'ঐতিহ্যানুসারে আমাদের পরিবার বিশ্বাসী ছিল শাক্তমতে। কিন্তু পিতামহ হরনাথ বসু ছিলেন একনিষ্ঠ বৈষ্ণব। অহিংসতায় বিশ্বাসী হওয়ায় মাতৃশক্তির উপাসনায় প্রচলিত পাঁঠা বলি বন্ধ করে দেন তিনি'। পূজা প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র আরও লিখেছেন— 'প্রতি বছরই চব্বিশ পরগনা জেলার কোদালিয়া গ্রামে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হতো দুর্গোৎসব।' সেই উপলক্ষ্যে বছরের শেষে সমস্ত গ্রামবাসীর সঙ্গে মিলনের সুখ উপভোগ করতেন তিনি। ছোটোবেলা থেকেই এই রকম পরিবেশে বড়ো হয়েছিলেন সুভাষ। প্রায় প্রতিবছরই পুজোর সময় কোদালিয়া এই বাড়িতে আসতেন সুভাষচন্দ্র। ছেলেবেলা থেকেই দেবীর স্তোত্রের প্রতি ছিল আন্তরিক আকর্ষণ। পুজার ক'দিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে স্নান সেরে নতুন জামাকাপড় পরে ভক্তিভরে দুর্গা দালানে বসে থাকতেন তিনি। মন দিয়ে শুনতেন চণ্ডীপাঠ, ভক্তিভরে অঞ্জলি প্রদান করতেন মায়ের চরণে, জলস্পর্শ করতেন চরণামৃত পান করেই। পূজার ক'দিন বাড়িতে তিনি ফল ও নিরামিষ ছাড়া অন্যকিছুই খেতেন না। ঠাকুরদালানে দাঁড়িয়ে অপলক নয়নে দেখতেন প্রতিমার আরতি, মায়ের উদ্দেশে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতেন বারবার। এক বছর পূজায় কোদালিয়ার বাড়িতে আসতে পারেনি সুভাষ। সালটা ছিল ১৯১২। তখন কটক র‌্যাভেনশ' কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র সে, পূজার পরেই পড়েছিল স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা, তাই সুভাষের পক্ষে সম্ভব হয়নি যাওয়া। পূজার দিনগুলোতে মাতৃপ্রতিমা দেখতে না পাওয়ার দুঃখে মা প্রভাবতী দেবীর উদ্দেশ্যে একটি মর্মস্পর্শী চিঠি লিখেছিলেন সুভাষ—

পরম পূজনীয়া শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী,

শ্রীচরণকমলেষু মা,

"আজ নবমী। সুতরাং আপনি এখন দেশে দেবীর আরাধনায় নিমগ্ন আছেন। এবার একটা দুঃখ রহিয়া গেল। সেটা বড়ো বেশি দুঃখ। সাধারণ দুঃখ নয় এবার দেশে যাইয়া সেই ত্রৈলোক্যপূজা, সর্বদুঃখহারিনি, মহিষাসুরমর্দিনী জগন্মাতা দুর্গাদেবীর সর্বাভরণভূষিতা নানা সাজসজ্জিতা, দেদীপ্যমানা জ্যোতির্ময়ী মূর্তি দর্শন করিয়া নয়ন সার্থক করিতে পারিলাম না। এবার পুরোহিত মহাশয় সেই মধুর পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ বা তাহার শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনির আওয়াজে শ্রবণশক্তি চরিতার্থ রতে পারলাম না। এবার কুসুম চন্দন ধূপাদি পবিত্র গন্ধের দ্বারা নাসিকাদ্বয়কে পবিত্র করিতে পারিলাম না; এবার একত্রে বসিয়া দেবীর প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া রসনেন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করিতে পারিলাম না, এবার পুরোহিত প্রদত্ত কুসুমরাশির দ্বারা স্পর্শেন্দ্রিয়কে ধন্য করিতে পারিলাম না এবং সর্বোপরি শান্তিজলের অভাবে শান্তিলাভ করিতে পারিলাম না। সবই নিষ্ফল হইল, পঞ্চেন্দ্রিয় নিষ্ফল হইল কিন্তু যদি দেবীর অম্বরব্যাপিণী মূর্তি দেখিতে পাইতাম তাহলে মা সে দুঃখ ঘুচিত। কিন্তু সেই আনন্দ সেইরূপ সৌভাগ্য কয়জনের কপালে ঘটিয়া থাকে। কাজে কাজেই আমার এই দুঃখ রহিয়া গেল। বিজয়া দশমীর দিন এখানে পড়িয়া থাকিব, কিন্তু মন আপনাদের নিকটেই থাকিবে। এরূপ পূর্ণ দিবসে এত আনন্দ হইতে বঞ্চিত

রহিলাম আর উপায় নাই কাল রাত্রিতে আমরা এখান হইতে আপনাদিগকে প্রণাম করিব, আপনিও বাবা সে প্রণাম গ্রহণ করিবেন ও গুরুজনদের দিবেন।"

আপনার সেবক—

সুভাষ

জগজ্জননী মহামায়ার পূজা দেখার জন্য বালক সুভাষের মন কতটা ব্যাকুল ছিল তা বোঝা যায় তার লেখা চিঠির বয়ানে।

ছোটোবেলা থেকেই সুভাষচন্দ্রের যেমন ছিল মাতৃভক্তি তেমনি ছিল দেশভক্তি। ছাত্রজীবন পেরিয়ে রাজনৈতিক জীবনেও তার ভক্তি বেড়েছে বই কমেনি। যুক্ত হয়েছিলেন তৎকালীন কলকাতার একাধিক সার্বজনীন দুর্গাপূজার সঙ্গে। ১৯৩২ সালে ব্রিটিশরা সিমলা ব্যায়াম সমিতি ক্লাবকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করায় বন্ধ হয়ে যায় দুর্গাপূজা। ১৯৩৪ সালে নিষেধাজ্ঞা উঠলে, ফের পূজা শুরু হলে পূজার সভাপতি হন সুভাষচন্দ্র। সুভাষচন্দ্র স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে তোলার জন্যেও বেছে নিয়েছিলেন দেবীপূজার প্রাঙ্গণ, যুক্ত হয়েছিলেন বিভিন্ন সার্বজনীন পূজার সঙ্গে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল দক্ষিণ কলকাতার আদি লেক পল্লীর পূজা, মধ্য কলকাতার ৪৭-এর পল্লীর পূজা, উত্তর কলকাতার কুমারটুলি, বাগবাজার সার্বজনীন। এমনকী জেলবন্দি থাকা অবস্থাতেও দুর্গাপূজা থেকে বিরত থাকেননি সুভাষচন্দ্র।

১৯২৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি তাঁকে পাঠানো হয়েছিল বার্মার মান্দালয় জেলে। সেই বছরই জেলে দুর্গাপূজার উদ্যোগ গ্রহণ করেন তিনি। আবেদন জানান কর্তৃপক্ষকে। সেইসময় জেলসুপার মেজর ফিন্ডলে পূজা করার অনুমতিও দিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্রকে। ১৮.০৮.২৫ তারিখে অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসুকে লেখা চিঠিতে সুভাষ লিখেছিলেন, যেহেতু জেলে খ্রিস্টান বন্দিদের অনুরূপ সুবিধা দেওয়া হয়, সেই জন্য আমাদের জাতির ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজার অনুমতি ও অর্থ দেওয়া হোক। এই আবেদনে জেল কর্তৃপক্ষ আমাকে অনুমতি দিয়েছে। এই চিঠির ভাষাতেই প্রমাণিত সুভাষচন্দ্রের নিজের হিন্দু ধর্মের প্রতি ছিল অগাধ আস্থা, ছিল সনাতন অনুরাগী।

স্বাধীনতার যুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে কঠিনতম লড়াইয়ের ইতিহাস রচনা করেছিল আজাদ হিন্দ বাহিনী। বার্মা হয়ে ভারত ভূখণ্ডে মণিপুরের মৈরাঙে ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিল তারা। মাতৃভূমিকে দখলমুক্ত করতে এই বৃহত্তর লড়াইয়ের প্রেক্ষাপট নির্মাণের পরিকল্পনা ও উদ্যোগ শুরু করতে ব্রিটিশ সরকারের চোখে ধুলো দিয়ে ছদ্মবেশে সুভাষচন্দ্রকে পাড়ি দিতে হয়েছিল বিদেশে। আর এই দুঃসাহসিক ঝুঁকিপূর্ণ কাজকে সম্ভব করতে তাঁর একমাত্র ভরসা ছিল 'রাম'। ব্রিটিশ ভারতে এদেশের প্রথম গুপ্তচর ছিলেন ভগৎ রাম তলোয়ার। এই 'রাম' নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে ভারত থেকে নিরাপদে পৌঁছে দিয়েছিলেন জার্মানি। ভগৎ রাম বিশ্বাস করতেন, তাঁর পূর্বপুরুষ ছিল পঞ্জাবি হিন্দু। সেই কারণেই নিজেকে 'হিন্দু পাঠান' বলে দাবি করতেন তিনি।

১৯৪১ সালের ১৭ জানুয়ারি কলকাতার এলগিন রোডের বাড়ি থেকে ছদ্মবেশে বেরিয়ে সড়কপথে বিহারের (বর্তমানে ঝাড়খণ্ড) গোমো স্টেশনে পৌঁছে যান সুভাষচন্দ্র। সেখান থেকে রেলপথে পেশোয়ার। পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী সেখানেই দেখা হয় ভগৎরামের সঙ্গে। এরপর দুর্গম পাহাড়ি পথে হেঁটে কাবুল যাওয়ার সময় ক্লান্ত সুভাষচন্দ্র তার ছায়াসঙ্গী ভগৎরামকে জিজ্ঞাসা করেন 'বর্ডার পার হতে, আর কত পথ বাকি'? ভগৎরাম বলেন বর্ডার তো আমরা অনেক আগেই পার হয়ে এসেছি। এই কথা শোনামাত্রই সুভাষচন্দ্র আনন্দে বলে ওঠে 'জয় বীরেশ্বর বিবেকানন্দের জয়' জয় ভারতমাতা কী জয়, আপাতত বিপদ কেটেছে ভগৎরাম।

তারপর জালালাবাদের রাস্তা ধরে তাঁরা পৌঁছে যান রাজধানী কাবুলে। সুভাষকে নিরাপদে কাবুলে নিয়ে যেতে দারুণ এক পরিকল্পনা করে ভগৎরাম। স্থানীয় পুস্তু ভাষা জানতেন না সুভাষ, ফলে তাঁকে বোবা-কালার অভিনয় করতে বলে ভগৎরাম। পরিকল্পনা মাফিক কাবুল যাওয়ার পথে চেকপোস্টে পুলিশের মুখোমুখি হলে ছদ্মবেশী সুভাষচন্দ্রকে নিজের আত্মীয় বলে পরিচয় দেন ভগৎরাম। পুলিশকে জানায় চিকিৎসার জন্যই কাবুল যাচ্ছে তারা। ভগৎরামের নিখুঁত পরিকল্পনায় সেদিন ঘোল খেয়েছিল ব্রিটিশ পুলিশ। যার ফলে সেদিন কাবুলে যাওয়ার অনুমতি পেয়েছিলেন সুভাষ- ভগৎরাম।

এরপর দীর্ঘ পথ পেরিয়ে ১৯৪৩ সালের ২১ অক্টোবর সিঙ্গাপুরের ক্যাথে সিনেমাহল থেকে 'অন্তর্বর্তীকালীন স্বাধীন ভারত সরকার'-এর ঘোষণা করেছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। ২২ অক্টোবর রাতে প্রধানমন্ত্রী নেতাজীর বাসগৃহে মন্ত্রীসভার দ্বিতীয় বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। প্রধানমন্ত্রী নেতাজী রাত দুটোর পর সিঙ্গাপুর রেডিয়ো মারফত যুদ্ধ ঘোষণা করার পরেই শুরু হয়ে যায় আজাদ হিন্দ সরকারের সামরিক অভিযান।

১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাসে এই স্বাধীন ভারত সরকারের হাতে চলে আসে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের শাসনভার। ২৯ ডিসেম্বর নেতাজী তার সহযোগীদের নিয়ে বিমানযোগে পৌঁছে যান ভারতের পোর্ট ব্লেয়ারে। পরের দিন পোর্ট ব্লেয়ারের জিমখানা মাঠে সর্বপ্রথম ভারত ভূখণ্ডে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন ভারতের অন্তর্বর্তীকালীন স্বাধীন সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। দিনটি ছিল ১৯৪৩ সালের ৩০ ডিসেম্বর। এর প্রায় ৮০ বছর পর ২০২৪ সালের ৩০ ডিসেম্বর অযোধ্যার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও রেল স্টেশনের উদ্বোধন করলেন বর্তমান ভারতের প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু ৩০ ডিসেম্বর দিনটিই কেন বেছে নিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী? এদিন তাঁর বক্তব্যে এই তারিখটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব তুলে ধরেন মোদী। তাঁর কথায়, '৩০ ডিসেম্বর একটি ঐতিহাসিক দিন, ১৯৪৩ সালের এদিনই আন্দামানের পোর্ট ব্লেয়ারে স্বাধীন ভারতের প্রথম জাতীয় পতাক তুলেছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।'

রামচন্দ্রের অকাল বোধনের দুর্গাপূজা থেকে ভগৎরামের সহযোগিতা, আবার পাঁচশো বছর পর সাংবিধানিক স্বীকৃতির নিরিখে শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমিতে নির্মিত রামমন্দিরের সঙ্গে বিশ্বের যোগসূত্রের কেন্দ্র বিমানবন্দর উদ্বোধনের দিনটিকে সুভাষচন্দ্রের জীবনের একটি বিশেষ দিনকে বেছে নেওয়ার ঘটনা প্রমাণ করে সেদিন থেকে আজ সর্বক্ষেত্রেই রামময়-সুভাষচন্দ্র। □

ভারতের সশস্ত্রবাহিনীর সঙ্গে মোকাবিলা করার আগে চীনের সতর্ক হওয়া উচিত

সুদীপনারায়ণ ঘোষ

ভারত ও চীনের সামরিক শক্তির তুলনা করা জটিল। কারণ এ বিষয়ে ভাবার মতো অনেক সূচক আছে। যেমন প্রত্যেক দেশের সামরিক বাহিনীর আকার, তাদের সরঞ্জামের গুণমান এবং তাদের সামরিক অভিজ্ঞতা। তবে গ্লোবাল ফায়ারপাওয়ারের ২০২৩ সালের সামরিক শক্তি সূচক অনুসারে সামরিক শক্তির দিক থেকে চীন বিশ্বের তিন নম্বর স্থানে আছে আর ভারত আছে চতুর্থ স্থানে (২০ জুন ২০২৩)।

এখানে চীন ও ভারতের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সামরিক পরিসংখ্যানের তুলনামূলক একটা হিসেব দেওয়া হয়েছে :

চীন ও ভারত যথাক্রমে, সক্রিয় কর্মী : ২০,৩৫,০০০ ও ১৪,৫৫, ০০০; রিজার্ভ কর্মী : ৫,১০,০০০ ও ১১,৫৫,০০০; প্রধান যুদ্ধ ট্যাংক : ৫,৯৯৫ ও ৪,৭৭০; যুদ্ধবিমান : ৩,৩২৫ ও ২,১৯৭; ধ্বংসকারী উপাদান : ৩৬ ও ১৩।

দেখা যাচ্ছে ভারতের চেয়ে চীনের বৃহত্তর সক্রিয় সামরিক বাহিনী এবং প্রধান যুদ্ধ ট্যাংক ও যুদ্ধবিমানের বৃহত্তর বহর রয়েছে। কিন্তু ভারতের বৃহত্তর সংরক্ষিত সামরিক বাহিনী এবং বৃহত্তর ডেস্ট্রয়ার বহর আছে। শেষ হিসেবে চীনা ও ভারতীয় সামরিক বাহিনীর আপেক্ষিক শক্তি বিতর্কের বিষয়। এমন কোনো একক ফ্যাক্টর নেই যা নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করতে পারে কোন দেশের সামরিক বাহিনী বেশি শক্তিশালী। তবুও উপরে তালিকাভুক্ত পরিসংখ্যান দুটো দেশের সামরিক বাহিনীর আপেক্ষিক ক্ষমতা সম্পর্কে কিছুটা আন্দাজ দেয়।

চীনের সামরিক শক্তি ভারতকে ছাড়িয়ে গেছে, এটা সামরিক দিক থেকে আরও শক্তিশালী দেশ হয়ে উঠছে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর ১৪.৫ লক্ষ সক্রিয় কর্মী আছে যা চীনা সেনাবাহিনীর চেয়ে ছোটো। তাদের আছে ২০.৩৫ লক্ষ সক্রিয় কর্মী (১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এর হিসাব)।

ভারতীয় নৌবাহিনী কি চীনের চেয়ে শক্তিশালী? ওয়ার্ল্ড ডিরেক্টরি অব মডার্ন মিলিটারি ওয়ারশিপস (২০২২) অনুসারে চীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। গ্লোবাল নেভাল পাওয়ারস র‌্যাঙ্কিং ২০২২-এ ভারত সপ্তম স্থানে রয়েছে (২৩ সেপ্টেম্বর ২০২২)।

ভারতীয় বিমান বাহিনী কি চীনের চেয়ে শক্তিশালী? চীনা বিমান বাহিনী, পিপলস লিবারেশন আর্মি এয়ার ফোর্স (পিএলএএএফ), নৌবহর এবং কৌশলগত তালিকার দিক থেকে ভারতীয় বিমান বাহিনীর (আইএএফ) তুলনায় শক্তিশালী। তবে আইএএফ অভিজ্ঞ সৈন্যদের কারণে আরও নির্ভরযোগ্য প্ল্যাটফর্ম এবং কৌশলগত ঘাঁটি স্থাপনে এগিয়ে। (৩১ জুলাই ২০২০)

তবুও ভারতীয় সেনাবাহিনী এত শক্তিশালী কেন? ভারতীয় সেনাবাহিনী জাতীয় শক্তির একটি প্রধান উপাদান। এটি বিশ্বের বৃহত্তম স্বেচ্ছাসেবী সামরিক বাহিনী। ভারতীয় সেনবাহিনী জাতিসঙ্ঘের শান্তি প্রতিষ্ঠার অভিযানেও সবচেয়ে বড়ো অবদানকারী। ভারত সারা বিশ্বে জাতিসঙ্ঘের বিভিন্ন মিশনে অংশগ্রহণ করেছে।

ভারত কেন প্রতিরক্ষায় এগিয়ে? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বার্ষিক প্রতিরক্ষা বাজেট তৃতীয় বৃহত্তম। এটা সৌদি আরবের পরে দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রতিরক্ষা আমদানিকারক যা বৈশ্বিক অস্ত্র আমদানির ৯.২ শতাংশ। ভারতের অভ্যন্তরীণ দেশীয় প্রতিরক্ষা শিল্প আছে যার ৬০ শতাংশ সরকারি মালিকানাধীন।

ভারতের সশস্ত্র বাহিনী চীনের প্রতিপক্ষের চেয়ে বেশি শক্তিশালী বলা হয়। একটা চীনা প্রবাদ আছে, 'একটা ন্যায়সঙ্গত উদ্দেশ্য প্রভূত সমর্থন পায় কিন্তু একটা অন্যায় উদ্দেশ্য কোনো সমর্থন পায় না'। চীনের পিপলস লিবারেশন আর্মি, পিএলএ (জনগণের মুক্তি বাহিনী) হলো সেই যাকে 'পার্টি গার্ডস' ('পার্টির পাহারাদার') বলে, সেটা সিসিপি দ্বারা, সিসিপির এবং সিসিপির জন্য (সিসিপি মানে চাইনিজ কমিউনিস্ট পার্টি)। নামে জনগণের মুক্তিবাহিনী কিন্তু তারা জনগণের জন্য লড়াই করে না, শুধুমাত্র সিসিপির জন্য লড়াই করে যা একটি অন্যায় উদ্দেশ্য, অন্যদিকে ভারতের সশস্ত্র বাহিনী জনগণের জন্য লড়াই করে, একটি সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত উদ্দেশ্য যা ভারতকে অভ্যন্তরীণ ভাবে বা বিদেশ থেকে আরও সাহায্য এনে দেয়।

সুতরাং 'মালাবার যুদ্ধ গেম'গুলোয় (এক যৌথ সামরিক মহড়া) দেখা গেছে ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান চীনকে একটি সংকেত বার্তা পাঠাতে তাদের উন্নত যুদ্ধজাহাজ দিয়ে মহড়া চালিয়েছে যা চীন উপেক্ষা করতে পারেনি। ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে মোকাবিলা করার আগে চীনের অত্যন্ত সতর্ক হওয়া উচিত।

সব মিলিয়ে চীনকে একাই লড়তে হবে আর ভারত তার মিত্রদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করবে। ঠিক এটাই চীন সবচেয়ে বেশি ভয় পায় এবং একই সঙ্গে চীনের পিএলএ-কে দুর্বল করে তোলে।

তিব্বত স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে ভারতের সীমান্তের উল্লেখযোগ্য দূরত্বের মধ্যে সামরিক/দ্বৈত-ব্যবহারের পরিকাঠামো নির্মাণ এবং ইতিপূর্বে তৈরি ঘাঁটিগুলোকে শক্তিশালী করছে চীন। ভারতীয় সেনাবাহিনী উন্নত পরিকাঠামো ও প্রতিরক্ষা প্রস্তুতির সঙ্গে যে কোনো দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুত রয়েছে। বেজিং তিব্বতে দ্বৈত-ব্যবহারের পরিকাঠামো উন্নয়ন--- নতুন এক্সপ্রেসওয়ে, আরও

বিমানবন্দর নির্মাণের পরিকল্পনা এবং তিব্বতকে জিনজিয়াং ও ইউনানের সঙ্গে যুক্ত করে দুটি নতুন রেললাইন বানাচ্ছে। সর্বশেষ বাজেটে চীন এই বছর ১.৭২ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে তিব্বতে ১৯১টি মূল প্রকল্প পরিকল্পনা করেছে।

২০২০-র জুনের নৃশংস গালোয়ান সংঘর্ষের পরে ভারতীয় সেনাবহিনী এবং পিএলএ উভয়ই তাদের সৈন্যদের সংহত করার পরে ভারতীয় সামরিক পরিকল্পনাবিদরা চীনাদের তুলনায় ভারতীয় বিমান বাহিনীর সুবিধার উপর আস্থা রেখেছিলেন। হিমালয়ে ভারতের পাদদেশে প্রচুর বিমান ঘাঁটি রয়েছে এবং সহজেই তার ফাইটার জেটকে সীমান্তে পাঠাতে পারে। বিমান ঘাঁটিগুলি একে অপরের ১০০ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত, অন্যদিকে তিব্বতে চীনা ঘাঁটিগুলি ৪০০ কিলোমিটার দূরে। উপরন্তু চীনা বিমানবাহিনীর সীমান্তের কাছাকাছি বিমানের কোনো আশ্রয়কেন্দ্র ছিল না— এটা একটা ত্রুটি। কিন্তু গত তিন বছরে চীন পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন করেছে। সর্বশেষ স্যাটেলাইট চিত্র দেখায় যে লাসা, তিব্বতের নাগরিক গুম্পা ও জিনজিয়াংয়ের হোতানে নতুন এয়ারফিল্ড এবং ফাইটার জেটগুলিকে রক্ষা করার জন্য শক্ত আশ্রয়কেন্দ্রগুলি-সহ বিমানক্ষেত্র সম্প্রসারিত করা হয়েছে। আকসাই চীনের অন্যান্য ছবি, যা ভারত দাবি করেছে কিন্তু চীনের দখলে রয়েছে, দেখায় যে সামরিক ব্যবহারের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র ও বাঙ্কার নির্মাণের জন্য পাহাড়ের ধারে একাধিক খাদ এবং টানেল খোদাই করা হয়েছে।

জবাবে ভারত লাদাখে এলএসি এবং অরুণাচল প্রদেশের ভারত-চীন সীমান্ত বরাবর প্রচেষ্টা জোরদার করেছে। ২০১৪-এর পরে গতি বাড়ে, কারণ ভারত সরকার কৌশলগত পরিকাঠামো উন্নত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। ২০১৪ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে ১৪৪৫০ মিটার সেতু এবং ৪৭৬৪ কিলোমিটার সীমান্ত সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। ভারত-চীন বর্ডার রোডস (আইসিবিআর) প্রোগ্রামের অধীনে চীনের সীমান্তের কাছাকাছি রাস্তা নির্মাণের বেশিরভাগ কাজ হচ্ছে। বর্তমানে প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপের কাজ চলছে; এর মধ্যে লাদাখ, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, সিকিম ও অরুণাচল প্রদেশে সেতু এবং টানেল-সহ ১৪৩৫ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ হয়েছে। অধিকন্তু ৮৭৫ কিলোমিটার ৩৭টি রাস্তা নির্মাণের প্রস্তাব বিবেচনা করছে যার বেশিরভাগই অরুণাচলের। নির্মাণাধীন ১৮০০-কিমি-দীর্ঘ সীমান্ত মহাসড়ক, এছাড়াও অরুণাচলের এবং জাতীয় মহাসড়ক ৯১৩ নামে পরিচিত, চীন সীমান্তকে স্পর্শ করে এবং তাওয়াং, আপার সুবনসারি, সিয়াং, দিবাং উপত্যকা হয়ে বিজয়নগরের সঙ্গে চীন-ভুটান-ভারত সীমান্ত ত্রি-জংশন এবং কিবিথু সংযুক্ত করে। এটা সম্পূর্ণ হতে তিন বছর সময় লাগবে বলে আশা করা হচ্ছে। এটি ভারতীয় সেনাবাহিনীকে প্রতিক্রিয়ার সময়, অ্যাক্সেস যোগ্যতা, রসদ এবং নাগালের ক্ষেত্রে একটি অভূতপূর্ব সুবিধা দেবে।

১৩০০০ ফুটেরও বেশি উচ্চতায় বিশিষ্ট সেনা টানেল সড়ক প্রকল্পের মাধ্যমে অরুণাচল প্রদেশে এবং এর মধ্যে প্রবেশাধিকার আরও উন্নত করা হবে যা তাওয়াংকে গুয়াহাটি এবং ৩১৭ কিলোমিটার বলিপাড়া-চারদুয়ার-তাওয়াং (বিসিটি) সড়কে নেচিফু টানেলের সঙ্গে সংযুক্ত করবে। সম্পূর্ণ হলে, উভয়ই অত্যাবশ্যক বছরভর গতিশীলতা নিশ্চিত করবে।

লাদাখে একটি নির্মাণাধীন রাস্তা হিমাচল প্রদেশের মানালি অক্ষ থেকে পশ্চিম লাদাখ এবং জান্সকার উপত্যকার সঙ্গে বিকল্প সংযোগ প্রদান করবে। ২৯৮ কিলোমিটার দীর্ঘ ডাবল লেন সড়কের দুই-তৃতীয়াংশ কাজ শেষ হয়েছে। কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ দারবুক-শিওক-দৌলত বেগ ওল্ডি (ডিএস-ডিবিও) পূর্ব লাদাখের রাস্তা, যা এলএসির কাছাকাছি, খুব উঁচুতে এয়ারফিল্ড ও সামরিক চৌকিগুলোতে যাতায়াতের সুবিধা দেয় তাও আরও উন্নততর করা হচ্ছে। নতুন রাস্তা যেমন লাদাখের চিসুমলে-ডেমচোক রোড ভারতীয় সামরিক বাহিনীর যুদ্ধ প্রস্তুতিকে উন্নত করেছে। ৫২ কিলোমিটার রাস্তাটি পূর্ব লাদাখের চুমার সেক্টরের শহরগুলিকে লেহ, নয়োমা ও কারু সামরিক স্টেশনগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করে।

ভারতীয় রেলওয়ে উত্তর-পূর্বে তিনটি কৌশলগত পথ তৈরি করছে যাতে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে দ্রুত গতিশীল করতে সক্ষম হয়; ভালুকপং ও তাওয়াং (অরুণাচল প্রদেশ)-এর মধ্যে একটি ২০০ কিলোমিটার লাইন, সিলাপাথর (অসম) ও বামে (অরুণাচল) হয়ে আলং হয়ে ৮৭ কিলোমিটার লাইন। রূপাই (অসম) ও পাসিঘাট (অরুণাচল)-এর মধ্যে ২১৭ কিমি লাইন। লখিমপুর (অসম) ও জিরোর মধ্যে একটি ১২৫ কিলোমিটার লাইন পরিকল্পনা করা হয়েছে। উত্তরে ৪৮৯ কিলোমিটার দীর্ঘ বিশাল উচ্চতায় ভানুপলি (পঞ্জাব)-লেহ রেল লাইনের কাজ চলছে।

ভারতীয় বায়ুসেনার (আইএএফ) এখন ২৫টি এয়ারফিল্ড রয়েছে যেখান থেকে তারা চীনে অপারেশন শুরু করতে পারে ও সীমান্তের কাছে তার অ্যাডভান্সড ল্যান্ডিং গ্রাউন্ডস (A:LGs) দ্রুত আপগ্রেড করছে। সমস্ত আইএএফ এয়ারফিল্ডগুলি শক্ত বিমান এবং সরঞ্জাম আশ্রয় পাচ্ছে। পূর্ব লাদাখে, ডিবিও, ফুকেহ ও নয়োমায়ে এয়ারফিল্ড তৈরি/আপগ্রেড করা হচ্ছে। এলএসি থেকে সবেমাত্র ৫০ কিমি দূরে নয়োমা বিমান ঘাঁটিটি পরিচালনার জন্য তৈরি করা হচ্ছে ই ফাইটার এয়ারক্রাফট, নতুন রাডার এবং আপগ্রেডেড মিলিটারি ড্রোন। নয়োমা ১৩৭০ ফুট উচ্চতায় বিশ্বের সর্বোচ্চ বিমানঘাঁটি, লেহ ও থয়েসের পরে যুদ্ধবিমান পরিচালনার জন্য লাদাখে তৃতীয় বিমানঘাঁটি হবে। অরুণাচলের তেজু, পাসিঘাট ও হোলঙ্গিতে তিনটি নতুন এয়ারফিল্ড তৈরি করা হয়েছে, যেখানে জিরো এয়ারফিল্ড এখন আপগ্রেড করা হয়েছে। তাদের সকলের দ্বৈত-ব্যবহারের সম্ভাবনা রয়েছে।

চীনের জিয়াওকাং গ্রামগুলির প্রতি ভারতের উত্তর হলো ভাইব্র্যান্ট ভিলেজ প্রোগ্রাম, অরুণাচল প্রদেশের কিবিথুতে ২০২৩ সালের এপ্রিলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ উদ্বোধন করেছেন। প্রোগ্রামটি অরুণাচল, সিকিম, উত্তরাখণ্ড, হিমাচল ও লাদাখের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে চীনের সীমান্তবর্তী ১৯টি জেলার ৪৬টি ব্লকের ২৯৬৭টি গ্রাম চিহ্নিত করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার ২০২৩ অর্থ বর্ষ থেকে ২০২৬ অর্থ বর্ষ পর্যন্ত এতে ৪৮০০ কোটি টাকা খরচ করবে যার মধ্যে এই সীমান্ত গ্রামগুলির সঙ্গে সড়ক যোগাযোগের জন্য ২৫০০ কোটি টাকা রয়েছে।

চীনা ও ভারতীয় সীমান্ত গ্রামগুলির মধ্যে একটা পার্থক্য হলো যখন চীনের ডিয়াওকাঙে দ্বৈত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত গ্রামগুলো শূন্য থেকে তৈরি করা হয় সাধারণত প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে কোনও বাসস্থান ছিল না, আর সেখানে ভারতীয় কর্মকাণ্ড চালানো হয় সীমান্ত এলাকায় বিদ্যমান গ্রামগুলিতে আধুনিক পরিকাঠামো নির্মাণের জন্য। উত্তরাখণ্ডের পিথোরাগড়ের সীমান্ত জেলা থেকে পাঁচবারের বিধায়ক বিশান সিংহ চুফাল ব্যাখ্যা করেছেন যে সাম্প্রতিক দশকগুলিতে এই অঞ্চলগুলিতে দুর্বল যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকায় এবং জীবিকার সুযোগের সন্ধানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় মানুষ বাইরে গেছে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো পর্যটনের প্রচার— অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম, হোমস্টে নির্মাণ এবং উৎসব ও মেলার প্রচার। এই গ্রামগুলির অন্তর্নিহিত লক্ষ্য হলো চীনের কার্যকলাপের উপর বিশ্বস্ত নাগরিকদের নজরদারি করে সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তা জোরদার করা। □

রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তে সংকটে সাধারণের শিক্ষা

ভেঙে ফেলা সহজ, নির্মাণ কঠিন। নির্মাণের সঙ্গে লেপটে থাকে মেহনতি মানুষের ঘাম, মানুষের রুচিবোধ ও সংস্কৃতি যা সুন্দর সুস্থ সমাজ গঠনের আকর। যুগে যুগে চলছে এ ভাঙা গড়ার লড়াই একদিকে ভাঙনের কাপালিক, অন্যপাড়ে সৃষ্টির ভগীরথ। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি সেকথার ধার ধারে না। আজ শাসকের অন্যায় সিদ্ধান্তে ধুঁকছে সাধারণের শিক্ষা। বর্তমান সমাজে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে আচার্য জগদীশচন্দ্র পর্যন্ত রাজনীতির ধ্বজাতে বিরাজমান। বাদ দেয়নি রামকৃষ্ণদেব বিবেকানন্দের মতো গুণীজনকেও। শিক্ষার নামে চলছে রাজ্যে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা।

বর্তমানে এ রাজ্যে দিকে দিকে পোস্টার 'ঘরে ঘরে সরস্বতী' কিন্তু কোথায় সেই শিক্ষার অঙ্গন ও তার প্রসার। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে রাজনীতির নোংরা মোড়কে মুড়ে বিক্রি হচ্ছে চড়াসুদে। জীবনের প্রথম বড়ো পরীক্ষাও (মাধ্যমিক) আজ প্রমাণ করে দিচ্ছে সাধারণের শিক্ষাকে কতটা সংকটজনক পরিস্থিতিতে ফেলেছে। সময় ঠিক রেখে পরীক্ষা হলেও সময়ের মারপ্যাঁচে না ঘটছে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার, না হচ্ছে উচ্চমানের শিক্ষা।

জীবনের প্রথম বড়ো পরীক্ষায় অন্যায় উক্তি, ঘৃণ্য প্রতিশ্রুতি— 'উনি পাশ করিয়ে দেবেন' শিক্ষাকে কতটা পিছিয়ে দিয়েছে তা বোঝার অবকাশ রাখে না। যে দেশে একটি সাধারণ বানান বলতে না পারা ছাত্র-ছাত্রী ফলাফলে সেই বিষয়ে ৮০ শতাংশ নম্বর পায়, তাহলে ভেবে দেখুক এই অশিক্ষিত সমাজে শিক্ষার মান কোথায়? বিদ্যালয় শিক্ষাদপ্তর অনিয়ম ও দুর্নীতির আতুঁড়ঘরে পরিণত হয়েছে। রাজ্যের বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষাব্যবস্থা প্রায় ভাঙনের মুখে। আকণ্ঠ দুর্নীতিতে নিমগ্ন ছাত্র-ছাত্রী তৈরির কারিগরেরা রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সমূলে উৎপাটিত করার সিদ্ধান্তে অটল। প্রত্যেকদিন বালিচুরি সোনাচুরি থেকে শুরু করে চাকরি চুরির সংবাদ পড়তে পড়তে বড়ো হচ্ছে আগামী প্রজন্ম। হাতের পুতুল হয়ে পড়েছে সরকারি শিক্ষাক্ষেত্র ও শিক্ষকেরা। এতে রাজ্যের শাসকদলের কিছু এসে যায় না। একটা গোটা প্রজন্ম আজ চরম সঙ্কটের মুখোমুখি। শিশুমনে গাঁথছে কুকাজের খতিয়ান। বেসরকারি স্কুলগুলি শাসকদলের ঝান্ডার তলায় কোটি কোটি টাকার ব্যবসা চালাচ্ছে। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি তীব্র ধিক্কার।

সমাজ হোক নির্মল, পাপমুক্ত। যা আগামীদিনে প্রত্যেকের চলার পাথেয় হবে তা হলো দুবেলা দুমুঠো খেয়ে শিক্ষাকে মাথায় নিয়ে আগামীর পথ মসৃণ করা।

শিক্ষা হোক সর্বসাধারণের, শিক্ষা হোক জনসাধারণের, জয় হোক শিক্ষার। বেজে উঠুক বিজয় তুর্য।

—সম্রাট শীল,
বরানগর, কলকাতা।

অন্যভাবে রাজ্যপাট

জাতীয়বাদী স্বস্তিকা পত্রিকার আমি একজন নিয়মিত পাঠক। সব লেখাই প্রায় খুঁটিয়ে পড়ি। তবে কয়েকটি লেখা আমাকে বিশেষ আকর্ষণ করে। বিশেষ করে রাজ্যপাট আগেই পড়ি। লেখক শ্রীনির্মাল্য মুখোপাধ্যায় বিশিষ্ট সাংবাদিক ও খুবই অভিজ্ঞ লেখক। তাঁর লেখা সম্পর্কে মন্তব্য করতে একটু সাহসের দরকার হয়। তিনি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাট অর্থাৎ রাজ্যসরকারের কাজকর্ম বিশেষত বর্তমান পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতির বিষয়ে নিয়ে বিশ্লেষণ করেন যা যথেষ্ট তথ্যসমৃদ্ধ এবং অকাট্য যুক্তি নির্ভর। সবকিছুর মধ্যেও আমার বিনীত অনুরোধ নির্মাল্যবাবুর কাছে একই লেখায় 'মমতা' নামটা যদি ব্যবহার কম করেন তাহলে বেশি ভালো লাগত। নামটি শুনতে ভালো লাগে না, সবাই ব্যাপারগুলো জানে তাই নাম না করে লিখলেও সকলে বুঝবে। যেমন গত ২৯ জানুয়ারি সংখ্যায় মমতার নাম প্রায় আটবার ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরের দুর্নীতি ছাড়াও রাজনীতি ও সমাজ বিষয়ক অন্য অনেক বিষয় আছে— যেগুলি নিয়ে রাজ্যসরকারের কী করা উচিত বা কতটা করলে রাজ্য আরও এগিয়ে যাবে এই বিষয়ে সদর্থক প্রস্তাব থাকলে পাঠকরা সমৃদ্ধ হবেন।

—সুকুমার করণ,
খড়্গাপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর।

খ্রিস্টমত ও সনাতন ধর্মের তফাত

খ্রিস্টানদের মতে যিশু হলো ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র এবং বাইবেল হলো বিশ্বের একমাত্র পবিত্র বই। যার প্রতিটি বাক্য নাকি সত্য। তাঁরা মনে করেন খ্রিস্টমতের মানুষদের মধ্যে জাতিভেদ নেই। কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে রয়েছে। খ্রিস্টানদের মতে যদি বাইবেলের এক এক বাক্যে সত্য লেখা আছে, আর তা হলো পবিত্র। তাই যদি হয় তবে বাইবেল অনুসারে পৃথিবীর উৎপত্তি যিশুর জন্মের ৪০০০ হাজার বছর আগে হয়েছে। অর্থাৎ বাইবেল অনুসারে এখন পৃথিবীর বয়স হয় মাত্র ৬০২০ বছর। এখন বিজ্ঞান অনুসারে পৃথিবীর বয়স হলো ৪.৮ বিলিয়ন বর্ষ যা বাইবেলে বলা বয়সের থেকে অনেক বেশি। তার মানে বাইবেল এমন এক ফিকশন বুক যা একটি মিথ্যে গল্পের সংকলন। প্রথম শতাব্দীতে খ্রিস্ট মত তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিল, যারা একে অপরের ঘোর বিরোধী ছিল। যারা ছিল পরস্পরের শত্রু।

—শুভময় দেব,
বারুইপুর, কলকাতা-৭০০১৪৪।

মালদ্বীপ কি চীনে জমি কিনে দেশ বানাবে?

জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সর্বোচ্চ এক মিটার উঁচুতে অবস্থিত

ফঃ ৩

মালদ্বীপের জলের নীচে ডুবে যেতে পারে বলে ২৯৮ বর্গকিলোমিটারের মতো জায়গা, সাড়ে ৫ লক্ষ (২০২১) সুন্নি মুসলমান জনসংখ্যা, জাতীয় ঋণ জিডিপির ১২৪.৮ শতাংশ (২০২১)। জিডিপি মাথাপিছু ১৫.৯৬২ ইউএসডি (২০২২) বা জিডিপি গ্রোথ ৩৭.০ শতাংশ (২০২১)। ভারত, শ্রীলঙ্কা, অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে এতদিন আলোচনা করছিল জায়গা কিনে নতুন মালদ্বীপ গড়ার। কিন্তু সেই টাকা এদের নেই। লোভের বশবর্তী হয়ে, অতি অমুসলমান বিরোধিতার জন্য নতুন সরকার ও মন্ত্রীরা কূটনীতি বিসর্জন দিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর অপমান শুরু করেছে। ভারতীয় জনগণ প্রতিবাদ করলেও, ভারতের বিরোধী দলগুলোর নেতারা কোনো প্রতিবাদ করেনি। এখন পর্যন্ত পাওয়া প্রমাণ অনুযায়ী, খ্রিস্ট জন্মের ৪০০ বছর আগে অর্থাৎ ২৪০০ বছর আগে মালদ্বীপে মানুষ বসবাস করা শুরু করে। মালদ্বীপে হিন্দু ও বৌদ্ধ সভ্যতার অনেক নিদর্শন পাওয়া গেছে। ১১৫৩ সলে আরবের লোকেরা এদের সুন্নি ইসলামে কনভার্ট করা শুরু করে। ১৫৫৮-১৫৭৩ পর্যন্ত মালদ্বীপ পর্তুগিজদের দখলে ছিল। তারপর নেদারল্যান্ডের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ব্রিটিশদের দখলে ছিল ১৮৮৭-১৯৬৫ পর্যন্ত। ১৯৬৫ থেকে মালদ্বীপে মহিলাদের ভোটাধিকার চালু হয়েছে। প্রেসিডেন্ট শাসিত দেশের বর্তমান মজলিশে (পার্লামেন্টে) সদস্য ৫০ জন।

মালদ্বীপবাসীরা মদ খেতে পারে না। খেলে বিশাল শাস্তি। তবে হোটেলের মধ্যে বিদেশি টুরিস্টরা মদ খেতে পারে। সাড়ে ৫টা রাজনৈতিক দল। ১১৯৬টি দ্বীপ নিয়ে গঠিত মালদ্বীপে ১৯টা জিলা, ২টা শহর; প্রতি বর্গকিলোমিটার ১৮০২ জন বাস করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি বছরে ১.৮ শতাংশের বেশি। সারা বছর তাপমাত্রা ৩০-২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এদের মূল ভাষা ধিবেহী যা সিংহলি ভাষা থেকে এসেছে, লাক্ষাদ্বীপের অনেক অধিবাসীও এই ভাষায় কথা বলে। ধিবেহী আরবি ভাষার মতো ডান থেকে বামে লেখা হয়। ৯৯ শতাংশ অধিবাসী নিজের নাম লিখতে পারে। ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মের ব্যক্তিকে ২০০৭ সাল থেকে মালদ্বীপের নাগরিকত্ব দেওয় হয় না। ২০১৫-তে ১২ লক্ষ টুরিস্ট মালদ্বীপে বেড়াতে আসে। তার মধ্যে ভারতীয় টুরিস্ট ছিল ৪.২ শতাংশ, ৩০ শতাংশ চীনের, জার্মানির ৮.৫ শতাংশ, মোট ৫৭ শতাংশ ইউরোপিয়ান টুরিস্ট।

প্রকাশ্যে অমুসলমানরা তাদের ধর্ম আচরণ করতে পারে না। করলে বিশাল শাস্তি। বিজ্ঞাপনের কারণে মালদ্বীপে ভ্রমণ। একটা দ্বীপে কয়েকজনের সঙ্গে আধুনিক সুবিধায় কয়েক দিনের জন্য বিশাল খরচ করে থাকা একটা স্টেটাস সিম্বল। ভারত চাইলে আন্দামান লাক্ষাদ্বীপে মডার্ন ট্যুরিস্ট স্পষ্ট খুলতে পারে। তা হলে কম খরচে দেশ বিদেশের লোকেরা ভ্রমণ করতে পারবে। মালদ্বীপ সরকার, ট্রাভেল ব্যবসায়ীরা পিআর করে টুরিস্ট বাড়াতে অনেক পত্রিকাকে টাকা দেয়।

মালদ্বীপকে চীনের দরকার সামরিক কারণে। ২০১৫-তে মালদ্বীপের টুরিস্টদের ৩০ শতাংশ চীনের। ভারতের মাত্র ৪.২ শতাংশ। কাজেই মালদ্বীপ তাকিয়া নীতি মেনে, স্বার্থের কারণে এখন চীনের পক্ষে থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। যারা তাকিয়া নীতিতে বিশ্বাসী, তাদের যতই সাহায্য দেওয়া হোক, কখনো আপন করা যায় না।

—**মৃণাল মজুমদার,**
বার্লিন, জার্মানি।

রাজনৈতিক নাটক

গত ২ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় রেড রোডে বি.আর আম্বেদকরের মূর্তিতে মালাদান করে ধরনায় শামিল হলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় বঞ্চনা এবং আর্থিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে তাঁর এই ৪৮ ঘণ্টা ব্যাপী ধরনা ও প্রতিবাদ। কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির নাম পালটে দেওয়া, পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে ব্যাপক চুরি, আবাস যোজনার কাজে সীমাহীন দুর্নীতি, ফান্ড ডাইভারশন ইত্যাদি দুর্নীতি অনেক দিন আগেই সামনে এসেছে। প্রকল্পগুলির নিয়মিত অডিট বা কেন্দ্রের প্রদত্ত অর্থের খরচের যথাযথ হিসেব দিতে প্রথম থেকেই ব্যর্থ এই রাজ্য। কেন্দ্র খরচের হিসেব চাইলে মুখ্যমন্ত্রীর যুক্তি ছিল এইসব টাকা রাজ্যের হকের পাওনা, কেন্দ্রকে হিসেব দিতে তিনি বাধ্য নন। হিসেব দেওয়ায় রাজ্যের গড়িমসি, দুর্নীতি ধরা পড়ে যাওয়ার কারণে কেন্দ্র পরবর্তী আর্থিক বছরগুলির কিস্তির অর্থ পাঠানো স্বাভাবিকভাবেই বন্ধ করে দেয়। তারপরেই ব্যাকফুটে চলে যাওয়া মুখ্যমন্ত্রী আসরে নামান তাঁর ভাইপোকে। কাজ না হওয়ায় দলীয় সাংসদদের নিয়ে গত ডিসেম্বরে প্রধানমন্ত্রীর সামনে হাজির হন।

কেন্দ্র ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতিতে রাজ্যের পাওনা মেটাতে সম্মত হলেও নির্বাচন শিয়রে আসায় ফের কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রসঙ্গ তুলে, নিজের লাগামহীন দুর্নীতি ঢাকতে, কেন্দ্রীয় প্রকল্পের পাওনা ছাড়াও কেন্দ্রীয় আয়কর ও জিএসটি-তে রাজ্যের অংশ আদায়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন তিনি ও তাঁর দলের নেতারা কলকাতা জুড়ে মিছিল ও ধরনায় শামিল হয়েছেন। কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলিতে প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকার কোনো হিসেব দিতে না পেরে, ক্যাডবেরি-ফিশ ফ্রাই খাওয়া ধরনামঞ্চে 'ধরনা' নামক তাঁর এই রাজনৈতিক নাটক বহুদিন আগেই ধরা পড়ে গেছে। এখন তার এই অস্ত্রটি ভোঁতা হয়ে গেছে। এই ধরনা আয়োজনের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে পুলিশ ডিএ আন্দোলনারী এবং কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মোতাবেক গান্ধী মূর্তির পাদদেশে অবস্থানরত এসএলএসটি চাকরি প্রার্থীদেরও গায়ের জোরে তুলে দিয়েছে বলে খবর। মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন অন্য কোনো রাজনৈতিক দল যেখানে সভা-সমাবেশ করার অনুমতি পায় না, সেখানে রাজ্যের শাসক দল হিসেবে তাঁর দলের এই মিছিল ও ধরনা হেঁকে ডেকে আইন ভাঙার শামিল! মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন মুখ্যমন্ত্রীর এহেন রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ কোনোভাবে কাম্য নয়। রাজ্যের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের এই রাজনৈতিক জোরজুলুম, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং রাজ্য জুড়ে অব্যবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার ও একজোট হওয়ার সময় এসেছে।

—**অনির্বাণ গাঙ্গুলি,**
দমদম, কলকাতা।

পারিবারিক জীবনের অভিশাপ : বধূনির্যাতন ও বৃদ্ধাশ্রম

মালবিকা দাস প্রামাণিক

বর্তমান সমাজ জীবনের একটি বড়ো সমস্যা দেখা দিয়েছে, তা হলো ব্যস্ত জীবনযাত্রা আর তার ফলে ব্যক্তি জীবনে সময়ের অভাব। এই সময়ের অভাবের ফলে ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের বন্ধন অনেক হালকা হয়ে যাচ্ছে। তার ফল হিসেবে আমাদের যেমন সামাজিক জীবনের দৃঢ়বন্ধন শিথিল হচ্ছে তেমনি পারিবারিক সম্পর্কগুলোর মূল্যও কমে যাচ্ছে। তার ফলে পরিবার থেকে বৃদ্ধ অসহায় বাবা-মায়ের স্থান হচ্ছে বৃদ্ধাশ্রমে।

সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রেই নানারকম বার্তা প্রদানের চেষ্টা চলছে, যে, বাবা-মা তাঁর জীবনের সমস্ত কিছু দিয়ে সন্তান লালনপালন করেছেন, শেষ জীবনে সেই বৃদ্ধ বাবা-মা'র অসহায় অবস্থায় তার স্থান হচ্ছে বৃদ্ধাশ্রমে যা কোনো ভাবেই মানবতার পর্যায় বাচক নয়। বৃদ্ধাশ্রমে মা-বাবা তাঁর সন্তানের জন্য আকুল হয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে সন্তানের অমানবিকতার যেমন প্রকাশ ঘটে, তেমনি দায়ী করা হয় পুত্রবধূর আচরণ এবং তার শিক্ষাদীক্ষার ওপর।

অপরদিকে আমরা যে সমাজে বাস করি সেখানে পণপ্রথার সঙ্গে প্রত্যেকেই পরিচিত। সমাজের কত নারী যে এই পণের বলি হয়েছে বা নির্যাতিতা হয়েছে তার খবর কম বেশি প্রত্যেকেই জানি। একজন নারী যখন তার বাবা-মা এবং আশৈশব বেড়ে ওঠা স্থান থেকে অন্য স্থানে, অন্য সংসারে প্রবেশ করে, তখন সামাজিক নিয়ম রীতিনীতির দ্বারা তাকে লক্ষ্মীর মর্যাদা দেওয়া হলেও আদৌ পরিবারে লক্ষ্মীর স্থান কি সব নারীরা পেয়ে থাকেন? নিশ্চয় নয়। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রতিনিয়ত দেখা যায় গৃহবধূর নির্যাতন ও আত্মহত্যার ঘটনা। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ ছাড়াও আরও কত নারী নির্যাতন ও মৃত্যুর ঘটনা সবার অলক্ষ্যে থেকে যায় তার হিসাব কেউ রাখে না। এর জন্যে যেমন দায়ী পণপ্রথা, তেমনি পারিবারিক হিংসা। সমাজে শিক্ষার হার বাড়ছে, তাই প্রত্যেকেই যদি মানবিক দৃষ্টিতে সমস্ত কিছু বিচার করে তাহলে একজন গৃহবধূও যেমন নির্যাতিতা হবে না, তেমনি বৃদ্ধ মা-বাবাকেও অসহায় জীবনযাপন করতে হয় না।

আগে সমাজে চতুরাশ্রম প্রথা প্রচলিত ছিল— ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। গার্হস্থ্য জীবনের পর বৃদ্ধরা বানপ্রস্থ এবং পরবর্তীতে সন্ন্যাস জীবনে পদার্পণ করত স্বেচ্ছায় কিন্তু সেই অবস্থায় তাদের অসহায়তা পরিলক্ষিত হতো কিনা তা বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে।

বর্তমানে আমাদের আধুনিক ও চাহিদাসম্পন্ন জীবন যে আমাদের চিত্তচাঞ্চল্যের জন্য অনেকটা দায়ী তা আমরা বলতে পারি। অন্যদিকে পরিবারে একজন নতুন বধূকে যথাযোগ্য মর্যাদায় আপন করে নেওয়ার দায়িত্ব যেমন পরিবারের সর্বময়ী কর্ত্রী একজন নারীর ওপর বর্তায়, তেমনি বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে সম্মানের সঙ্গে রাখার দায়িত্বও বর্তায় বধূরূপী আর একজন নারীর ওপর। প্রাণীমাত্রই পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর নির্ভরশীল। তাই একজনকে যদি যোগ্য সম্মান দেওয়া হয়, অপরপক্ষও যোগ্য মর্যাদা দেবে। তবেই সমাজ থেকে অবলুপ্ত হবে পারিবারিক হিংসা এবং তার থেকে উদ্ভূত নানান সমস্যা। আর তাতেই দূরীভূত হবে বধূনির্যাতন ও বৃদ্ধাশ্রমের মতো পারিবারিক জীবনের অভিশাপ। □

ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিত লৌহপুরুষ লালকৃষ্ণ আদবাণী

ভারতের প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রী, প্রবীণ রাজনীতিবিদ লালকৃষ্ণ আদবাণীকে ভূষিত করা হলো ভারতের সর্বোচ্চ অসামরিক পুরস্কার 'ভারতরত্ন' সম্মানে। গত ৩ ফেব্রুয়ারি এই বিষয়ে ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে প্রধানমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবাণীকে অভিনন্দন জানান। ট্যুইটে তিনি বলেন, 'শ্রী এল কে আদবাণীজীকে ভারতরত্ন প্রদান করা হবে তা জানাতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। আমাদের সম্মানিত রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে তিনি অন্যতম। ভারতের উন্নয়নে তাঁর অবদান স্মরণীয়। তিনি যেমন তৃণমূল স্তরেও কাজ করেছেন তেমনই উপ-প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেশের সেবাও করেছেন'। এই প্রবীণ বিজেপি নেতার সঙ্গে তাঁর দুটি ছবিও শেয়ার করেছেন প্রধানমন্ত্রী। ট্যুইটে তিনি আরও লিখেছেন, 'ওঁকে ভারতরত্ন প্রদান করতে পারাটা আমার কাছে অত্যন্ত আবেগের একটি মুহূর্ত। আমি যে তাঁর সঙ্গে কাজ করার এবং তাঁর কাছ থেকে শেখার অশেষ সুযোগ পেয়েছি, তার জন্য আমি সর্বদাই এটিকে আমার সাফল্য বলে মনে করব'।

লালকৃষ্ণ আদবাণীর ১৯২৭ সালে করাচির সিন্ধি ব্যবসায়ী পরিবারে জন্ম। শিক্ষা করাচির সেন্ট প্যাট্রিক স্কুলে। দেশভাগের সময় তিনি পরিবারের সঙ্গে আসেন ভারতে। তৎকালীন বম্বেতে এসে শুরু হয় তাঁদের বসবাস। তিনি ভারতীয় রাজনীতির অন্যতম সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। ভারতীয় রাজনীতির আঙিনায় তিনি লৌহপুরুষ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শের অন্যতম মুখ তিনি। ৯৬ বছরের লালকৃষ্ণ আদবাণী দেশের রাজনীতিতে একের পর এক মাইলস্টোন পেরিয়েছেন। দীর্ঘ কয়েক দশকের তাঁর রাজনৈতিক ক্যারিয়ার। ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য তিনি। দলের আদর্শ ও নীতি গঠনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর পথ চলা শুরু রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের একজন স্বয়ংসেবক হিসেবে। সঙ্ঘের কার্যকর্তা রূপে তাঁর নেতৃত্বদানের ক্ষমতা সকলের নজর কাড়ে। কম বয়সে সঙ্ঘের প্রচারক হয়ে রাজস্থানে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। ১৯৭০ সালে হয়েছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ। ১৯৭৩ সালে জনসঙ্ঘের সভাপতি পদে আসীন ছিলেন। পরবর্তীকালে জনসঙ্ঘ জনতা পার্টির সঙ্গে মিশে যায়। আদবাণীজী হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

শ্রীরামজন্মভূমি আন্দোলন ও রথযাত্রার অন্যতম পথিকৃৎ আদবাণীজীর পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা এই আন্দোলন চলাকালীন ছিল তুঙ্গে। এরপর প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর মন্ত্রীসভায় ২০০২ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত উপপ্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ভারতীয় রাজনীতির সংসদীয় ইতিহাসে লালকৃষ্ণ আদবাণী ছিলেন একজন বিশিষ্ট সাংসদ। ভারতের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে লালকৃষ্ণ আদবাণীর গভীর প্রভাব অনস্বীকার্য। ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিত হয়ে তিনি করজোড়ে প্রণাম জানালেন দেশবাসীকে। ধন্যবাদ জানালেন প্রধানমন্ত্রীকে। তিনি বলেছেন, 'এটা কেবলমাত্র একটা পুরস্কার নয়, যে নীতি ও আদর্শকে আমি বহন করি, সেটির সম্মান।'

রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে সম্মানিত পশ্চিমবঙ্গের ১১ জন

সাধারণতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে জানুয়ারিতে ঘোষিত হয়েছে পদ্ম পুরস্কার, ২০২৪ প্রাপকদের নাম। এই বছর দেশ ও বিদেশের ১৩২ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ভারতের রাষ্ট্রীয় সম্মাননা প্রদান করা হচ্ছে। এর মধ্যে প্রবীণ রাজনীতিবিদ লালকৃষ্ণ আদবানীকে ভারতরত্ন, কর্পূরী ঠাকুরকে মরণোত্তর ভারতরত্ন, ৫ জনকে পদ্মবিভূষণ এবং ১৭ জনকে পদ্মভূষণ পুরস্কারে সম্মানিত করা হচ্ছে। অন্যরা পদ্মশ্রী পাচ্ছেন। মহারাষ্ট্র ও উত্তরপ্রদেশ থেকে ১২ জন করে পদ্ম পুরস্কারে সম্মানিত হচ্ছেন। মহারাষ্ট্রের পদ্ম পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে ৫ জন হতে চলেছেন পদ্মভূষণ পুরস্কারে সম্মানিত। উত্তরপ্রদেশের সকলেই পদ্মশ্রী পুরস্কারে সম্মানিত হতে চলেছেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে ১১ জন রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। পদ্মভূষণ প্রাপকরা হলেন— সত্যব্রত মুখোপাধ্যায় (মরণোত্তর), গৌরাঙ্গ (মিঠুন) চক্রবর্তী ও ঊষা উথুপ। পশ্চিমবঙ্গ থেকে অন্য ৮ জন পদ্মশ্রী পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের পদ্মশ্রী প্রাপকরা হলেন— দুখু মাঝি (সমাজকর্ম), ড. নারায়ণ চক্রবর্তী (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি), সনাতন রুদ্র পাল (কলা), একলব্য শর্মা (বিজ্ঞান ও প্রকৌশল), নেপালচন্দ্র সূত্রধর (কলা), রতন কাহার (কলা), তকদিরা বেগম (কলা) ও গীতা রায়বর্মন (কলা)।

বৃক্ষরোপণকে জীবনের ব্রত করে পদ্ম সম্মানে ভূষিত দুখু মাঝি

উদয় কুমার নাথ।। লালমাটির জেলা পুরুলিয়া। চারিদিকে রুক্ষ প্রান্তর। সেখানে সবুজায়ন ঘটিয়েছেন যিনি, তিনি দুখু মাঝি। এলাকায় তাঁর পরিচিতি 'গাছবাবা' নামে। দশকের পর দশক ধরে বৃক্ষরোপণ-বনসৃজনের এই অক্লান্ত সাধনার স্বীকৃতি পেলেন তিনি। অযোধ্যা পাহাড়, বাঘমুণ্ডি এলাকা জুড়ে সর্বত্র বৃক্ষরোপণ করে চলেছেন দুখু মাঝি। পদ্ম সম্মানে ভূষিত করা হলো বাঘমুণ্ডি থানার সিন্দরী গ্রামের বাসিন্দা দুখু মাঝিকে। গাছবাবার এই সম্মান প্রাপ্তিতে অযোধ্যা পাহাড়ের নানা প্রান্তে বয়ে গিয়েছে আনন্দের জোয়ার।

ফাঁকা স্থানগুলিতে গাছ লাগাতেন তিনি। সারা জীবন ধরে এই কঠিন ব্রত পালন করে এখন তিনি ৮০ বছর বয়সে উপনীত হয়েছেন। কিন্তু একই উদ্যমে গাছ লাগিয়ে চলেছেন তিনি। সবাইকে দিয়ে চলেছেন বৃক্ষরোপণের বার্তা। কতগুলি গাছ তিনি লাগিয়েছেন? ওই অঞ্চলে অন্তত ৫ হাজার গাছ তিনি লাগিয়েছেন বলে জানা গেছে। দারিদ্র্যক্লিষ্ট সংসারে জীবন সংগ্রামরত দুখু মাঝির সম্বল একটি ভাঙাচোরা মাটির বাড়ি। বাড়ির চাল ঘাস পাতা দিয়ে ঢাকা। সংসারে রয়েছেন তাঁর স্ত্রী ও বিশেষ ভাবে সক্ষম এক পুত্র। তাঁর অন্য একটি ছেলে অন্যত্র থাকেন।

বার্ধক্যভাতার সামান্য পেনশন আর রেশনের বিনামূল্যে পাওয়া চালের মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করছেন তাঁরা তিন জন। কিন্তু এই দারিদ্র্যময় জীবন নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তিত নন তিনি। বৃক্ষরোপণেই তাঁর আনন্দ। শিশুকাল থেকেই তাঁর শখ বা নেশা— গাছ লাগানো। স্মৃতির সরণি বেয়ে দুখু বললেন, 'আমার এক কাকা ছিলেন, তাঁর সঙ্গে গাছ লাগাতাম। তখন আমরা পলাশগাছ বেশি লাগাতাম'। তাঁর প্রতিবেশী দেবব্রত কুইরী বললেন, 'ভালো লাগছে, আমাদের গ্রামেরই লোক। সরকারি জায়গা, ফাঁকা জায়গা দেখতে পেলেই উনি গাছ লাগান। আমরা উৎসাহ দিই। আমাদের কোনো জায়গা থাকলে

সেখানেই গাছ লাগাতে বলি জেঠুকে'। তাঁর এই নেশার জন্য বনদপ্তর থেকে উপহার স্বরূপ পেয়েছিলেন একটি সাইকেল। সেই সাইকেলটিই এখন তাঁর নিত্যসঙ্গী। একটি বালতি আর চারাগাছ নিয়ে সাইকেলে চড়ে বেরিয়ে পড়েন তিনি। কোনো ফাঁকা জমি বা সরকারি জমি খুঁজে পেলে সেখানে গাছ লাগান তিনি। তাঁর এই ভাবনা কাদের উদ্দেশ্যে? ৫ হাজার গাছের অভিভাবক পদ্মশ্রী প্রাপক দুখু মাঝি জানান অনাগত প্রজন্মের কথা ভেবেই তাঁর এই স্বার্থহীন পরিশ্রম, নিরলস প্রয়াস। আগামী প্রজন্মের সুরক্ষার স্বার্থে শুধু গাছ লাগিয়েই তিনি ক্ষান্ত হন না। প্রতিটি গাছের খোঁজ তিনি রাখেন, প্রতিনিয়ত গাছগুলির পরিচর্যা ও দেখভাল করেন। দীর্ঘদিন একটানা এই কাজ করে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা থেকে কিছু সহায়তা তিনি পেয়েছেন। ভারত সরকারের পদ্মশ্রী সম্মান লাভে কেমন লাগছে জানতে চাওয়ায় তিনি বলেন, 'ওঁরা দেবতা লোক, তাই এই পুরস্কার দিয়েছেন। খুব ভালো লাগছে'। নিজে নিরন্তর বৃক্ষরোপণের সঙ্গে অন্যদেরও প্রতি মুহূর্তে গাছ লাগানোর জন্য উৎসাহিত করে চলেন দুখু মাঝি। সকলের উদ্দেশ্যে তাঁর বার্তা— 'একটা গাছ কাটলে পাঁচটা গাছ লাগাবে, তাহলে অক্সিজেন পাবে। প্রয়োজন হলে গাছ কাটিস বাবা, নয়তো কাটিস না। গাছ কাটা মানে একটা জীব কাটা'। অনেকটাই বয়স হলো, আর কতদিন চলবে এই বৃক্ষরোপণ অভিযান? তাঁর দৃঢ় প্রত্যুত্তর, 'আরও গাছ লাগাব, গাছ লাগানোটাই আমার কাজ'। ■

'জীবনের শ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি'

চোখের জল মুছে বললেন রতন কাহার

তিলক সেনগুপ্ত।। বড়োলোকের বিটি লো গানের সুরকার ও গীতিকার সিউড়ীর রতন কাহারকে পদ্মশ্রী সম্মানের ঘোষণায় আপ্লুত রাঙামাটির বীরভূম। খুশি সিউড়ীর রতন কাহারের পরিবার।

প্রচণ্ড শীত বা বৃষ্টি যাই হোক, এই হেমন্ত ঋতুতে এক মাস ইনি কর্তব্যে অবিচল থাকেন। নিশিভোরে ঘুমিয়ে থাকা শহর বা গ্রামবাসীদের ঘুম ভাঙে তাঁর সুললিত কণ্ঠ আর খঞ্জনির শব্দে টহল গানের মধ্যে দিয়ে। সিউড়ি ভট্টাচার্য পাড়ার বাসিন্দা প্রবীণ এই লোকসংগীত শিল্পী দীর্ঘ ত্রিশ বছরের বেশি এই দায়িত্ব পালন করছেন অত্যন্ত ভালোবাসার সঙ্গে।

রতন কাহার তাঁর শিল্পচর্চা শুরু করেছিলেন আলকাপ গানের দলে যোগ দিয়ে। তরুণ তরন যাত্রার দলে 'ছুকরি'ও সাজতেন। বেঁধেছেন অজস্র ভাদু, ঝুমুর গান ও লোকগান। পুরস্কার-শংসাপত্র এতটাই পেয়েছেন যে একচিলতে খড়ের ঘরে তা আর রাখার জায়গা নেই। একবার ঝড়ে গাছ ভেঙে পড়ে বহু পদক নষ্ট হয়ে যায়। তবে অভাব তাঁর নিত্য সঙ্গী। তবুও কার্তিক মাসের শুরুর দিন থেকেই ভোর তিনটের সময় খঞ্জনি হাতে পথে নামেন নব্বই ছুঁই ছুঁই। শরীর সবদিন দেয় না। কিন্তু মন পাগল হয়ে ওঠে। শিল্পীর কথায়, 'কে যেন ভিতর থেকে প্রেরণা দেয়। কত মানুষ অপেক্ষা করে থাকে বছর ভোর। তাই শরীর নড়বড় করলেও বেরিয়ে পড়ি।'

একটা সময় সংসারে এতটাই অভাব ছিল যে তিনি বিড়ি বেঁধে সংসার চালিয়েছেন। তিনি আজও বাড়িতে বসে তিনি ছোটোবেলায় অন্ধ নেপাল দাসের কাছে শেখা টহলের পদ গান ভোরবেলায়। তিনি বললেন, 'জীবনটা অনেক কষ্টে কেটেছে। আমার মেয়েটা ভালো গান গায়। কিন্তু গানের মাস্টারও দিতে পারি নাই। হারমোনিয়ামও কিনে দিতে পারিনি। এখনও মেয়ের বিয়ে বাকি। সেটাই আমার দুশ্চিন্তা। সরকারি ভাতা এবং অনুষ্ঠান করে যা পাই তাতে কোনোরকমে চলে। তবে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত টহল দিয়ে যাব।'

দু' হাজার গানের লেখক শিল্পী রতন কাহার একসময় চুটিয়ে কাজ করেছেন আকাশবাণীতে। পরবর্তীতে দূরদর্শনেও। তিনি বলেন, পাহাড়ী সান্যালই আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন আকাশবাণীতে। তখন নিয়মিত কাজ করেছি।' ১৯৭২ সাল সেটা। কালজয়ী সেই গান, 'বড়োলোকের বিটি লো' গান লিখলেন। শিল্পী রতন কাহারের গলায়। বয়স ছাপ ফেলতে পারেনি গলায়। ১৯৭৬ সালে গানটির রেকর্ডিং করেন স্বপ্না চক্রবর্তী। সেই সময় এই গান লোকের মুখে মুখে ফিরতে শুরু করে। এখনও একই রকম জনপ্রিয় গানটির স্রষ্টা কিন্তু এই রতন কাহার। বড়োলোকের বিটি লো গানের কথা বলতেই স্মৃতিমেদুর হলেন প্রবীণ শিল্পী। তিনি বলেন, ওই গান আমি আগে রেডিয়োতে গেয়েছি। তার পরে অনেকেই করেছে। কিন্তু আমার নাম দিতে ভুলে গেছে। আমার লেখা, আমার

বাঁধা গান রেকর্ড করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমাকে কেউ মনে রাখেনি।

সংস্কার ভারতী বীরভূম জেলা সমিতির উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য রতনবাবু, ইতিমধ্যেই সংস্কার ভারতীর একাধিক অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করে সকলকে মোহিত করেছেন। সংস্কার ভারতী তাঁকে নটরাজ সম্মানে ভূষিত করেছে। স্বভাব কবি রতনবাবু আজও গান রচনায় মশগুল। আর কার্তিক মাস এলেই বেরিয়ে পড়েন পথে পথে নগর কীর্তনে। তবে অযাচক বৃত্তি নিয়ে। পথে কারও কাছে কিছু চান না তিনি।

আপনি রেওয়াজ করেন এখনও? উত্তরে জানালেন, 'গোটা হেমন্তকাল আমার রেওয়াজের ঋতু।'

তাঁর আক্ষেপ আমি মরে গেলে এই টহল কি উঠে যাবে! নতুন প্রজন্ম তো আর এই পথে আসছে না। গৌরহরির কী ইচ্ছা কে জানে!

পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত তিনি বলেন, 'জীবনের শেষবেলায় এই সম্মান আমার মতো গ্রামীণ শিল্পীদের বাঁচার সাহস জোগাবে।' তাঁর ছেলে শিবনাথ কাহার বলেন, 'আমিও গান করতে ভালোবাসতাম কিন্তু এত অভাব যে বাবা একটা হারমোনিয়াম কিনে দিতে পারেন নাই। আজ বাবা হারানো সম্মান ফিরে পেলেন এটাই সব চেয়ে বড়ো কথা।'

'বড়োলোকের বিটি লো, লম্বা লম্বা চুল, এমন মাথায় বেঁধে দেবো লাল গেঁদাফুল...' বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ায় সবচেয়ে ট্রেন্ডিং। বাংলা লোকগীতিকে নিজের র‍্যাপে ব্যবহার করে নয়া মোড়কে শ্রোতাদের কাছে নিয়ে এসেছেন র‍্যাপার বাদশা। আর তাই এই 'গেন্দাফুল' গানটির জন্য তাকে বিড়ম্বনাতেও পড়তে হয়েছে। কারণ এই লোকগীতি যাঁর সৃষ্টি, সেই গানের কোথাও রতন কাহারের নামের স্বীকৃতি নেই। ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পরই খ্যাতনামা র‍্যাপার বাদশার বিরুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়ায় নিন্দার ঝড় বইতে শুরু করে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে মঙ্গলবার অর্থাৎ ৩১ মার্চ' 'গেন্দাফুল' গান এবং পশ্চিমবঙ্গের রতন কাহার প্রসঙ্গে মুখ খুলতে বাধ্য হন বাদশা। মিলে যায় শিল্পীর স্বীকৃতি। ■

চোখ জোড়ানো শিল্পকর্মের স্রষ্টা সনাতন রুদ্র পাল পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত

শিল্পী মোহনবাঁশি রুদ্র পালের পুত্র কলকাতার প্রখ্যাত মৃৎশিল্পী সনাতন রুদ্র পাল পদ্ম পুরস্কারে ভূষিত হলেন। দুই প্রজন্মই খ্যাতনামা শিল্পী। সাবেকি থেকে থিমের প্রতিমা তৈরি— সব কিছুতেই সমান স্বচ্ছন্দ সনাতন রুদ্র পাল। তাঁকে সাবেকি প্রতিমার জাদুকর বলা হয়। মৃন্ময়ী প্রতিমায় চিন্ময়ী রূপদানকারী শিল্পীকে দেশের সরকার রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে সম্মানিত করায় তিনি অভিভূত। পদ্মশ্রী প্রাপকদের তালিকায় তাঁর নাম প্রকাশিত হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই আপ্লুত শিল্পী। ৫০ বছর ধরে তিনি এই কাজ করে চলেছেন। একসময় মৃৎশিল্পীরা সরকারের তরফে পুরস্কৃত হতেন। সেটা বহুকাল বন্ধ। কসবা সুনীল নগরের পুজোর জন্য তিনি একটি প্রতিমা গড়েন। সেই প্রতিমা পায় একটি বেসরকারি সংস্থার তরফে সেরার সম্মান। সেটাই তাঁর জীবনের প্রথম সব থেকে বড়ো পাওনা বলে জানান। তাঁর আক্ষেপ, বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার বহু মানুষকে পুরস্কৃত করে। সেই তালিকায় মৃৎশিল্পীদের সেভাবে স্থান হয়নি।

শিল্পীর কথায়, তাঁর এই পুরস্কার প্রাপ্তি মৃৎশিল্পের আগামী প্রজন্মকে উৎসাহিত করবে। সব শিল্পী চাইবেন ভালো কাজ করতে। থিমের প্রতিমার রমরমার জেরে সাবেকিয়ানা ফের জেগে উঠেছে, তাই কাজের ক্ষেত্রে তিনি মনে করেন এমন লড়াই থাকা ভালো। দুর্গা পূজাকে ইউনেস্কোর দেওয়া হেরিটেজ স্বীকৃতি একটা বড়ো প্রাপ্তি। মুখ্যমন্ত্রী কলকাতার পুজোর সেই স্বীকৃতি লাভকে উদ্‌যাপন করলেও, পুরস্কার প্রাপকের তালিকায় তাঁর নাম প্রকাশের পর রাজ্যের তরফে কোনো শুভেচ্ছাবার্তা আসেনি বলে তাঁর তেমন আক্ষেপ নেই। অভিমানের সুরে তিনি জানান, কেন্দ্র-রাজ্য দুই সরকারের আমাদের দিকে নজর একটু কম। কুমোরটুলির শিল্পীদের সরকারি সহায়তার জন্য সরব হন শিল্পী। তাতে শিল্পের কাজের আরও উন্নতি হবে বলে তাঁর আশা। অবাক করা প্রতিমা, চোখ জুড়ানো শিল্পকর্ম দিয়ে কয়েক দশক ধরে তিনি বাঙ্গালির মনন-চিন্তা-সংস্কৃতি-আবেগকে ছুঁয়ে গিয়েছেন। তাঁর তুলির টানে মাটির প্রতিমা যেন হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত। তাঁর শিল্পের জাদুর খ্যাতি দেশের গণ্ডী পেরিয়ে বিদেশেও সমানভাবে জনপ্রিয় ও সমাদৃত। বাঙ্গালির আবেগের সঙ্গে মিশে থাকা শিল্পী সনাতন রুদ্র পালের সঙ্গে কুমোরটুলির যেন নাড়ির যোগ। শিল্পী বলেন, 'এত বিরাট মাপের সম্মান পাওয়া আমার কাছে ভাগ্যের ব্যাপার। আমি ভারত সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞ। আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি'। ■

তকদিরা বেগম

বোলপুরের কাঁথাস্টিচ শিল্পীকে পদ্ম সম্মান

বোলপুরের কাঁথাস্টিচ শিল্পী তকদিরা বেগমকে কেন্দ্রীয় শিল্প মন্ত্রক থেকে ফোন করে তাঁর এই পুরস্কার প্রাপ্তির বিষয়টি জানানো হয়। তকদিরা সম্মতি দিলে তাঁর নাম ঘোষণা করা হয়। বীরভূমের এই স্বনির্ভর শিল্পীকে পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে সম্মান জানালো কেন্দ্রীয় সরকার। পূর্ব বর্ধমানের জয়কৃষ্ণপুর গ্রামের বাসিন্দা তকদিরা। প্রথাগত শিক্ষা দশম শ্রেণী পর্যন্ত। স্থানীয় স্কুলে ক্লাস দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে আর এগোতে পারেননি। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই ভালো লাগত সেলাই করতে। মায়ের কাপড় লুকিয়ে সেলাই করতেন। এই সেলাইয়ের কাজটিই হয়ে ওঠে তাঁর পরিচয়।

বিবাহিত জীবনে চলে আসেন বোলপুরের মাদ্রাসা পাড়ায়। এখন সেখানেই তাঁর বাস। সেলাইয়ের নেশাটা রয়ে গিয়েছিল। সব সেলাইয়ের মধ্যে কাঁথা-স্টিচের কাজের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল বেশি। কাঁথাস্টিচের কাজকেই পেশা হিসেবে বেছে নেন তিনি। সেই ভাবে শুরু করে তাঁর নিখুঁত সূচীকর্মের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কথা প্রচারিত হতে থাকে লোকমুখে। ধীরে ধীরে বিভিন্ন জেলা, এমনকী ভিন রাজ্যে তা পড়ে ছড়িয়ে। দেশের নানা প্রান্ত থেকে তাঁর কাছে কাজের বরাত আসে। কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় দুবাই, কাতার, আমেরিকা গিয়েছে তাঁর হাতের কাজ।

তিন মেয়েকে নিয়ে তাঁর সংসার। মায়ের থেকে কাজ শিখে নিয়েছেন তারাও। কাঁথাস্টিচের কাজ করে ক্রমশ জনপ্রিয়তা বাড়ছে কাঁথাস্টিচ শিল্পী তকদিরা বেগমের। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেলেও মায়ের সঙ্গে একাগ্রভাবে কাজ করে চলেছেন তাঁরাও। মেয়েরা চান মায়ের হাতের কাজ আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে যাক। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কেন্দ্রীয় শিল্প মন্ত্রকের প্রদর্শনীতে যোগ দেন প্রায়ই। তাঁরাও কাতার, দুবাই, আমেরিকা গিয়েছেন পসরা সাজিয়ে। ■

রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পেলেন পরিবেশবিদ ড. একলব্য শর্মা

এই বছর পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হয়েছেন প্রখ্যাত পরিবেশবিদ, বিজ্ঞানী ড. একলব্য শর্মা। মূলত হিমালয় ও হিমালয়ের পাদদেশের পরিবেশ, বাস্তুতন্ত্র, জীববৈচিত্র্য, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি নিয়ে গবেষণামূলক অবদানের জন্য তাঁকে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। কার্শিয়াঙে তাঁর জন্ম। কার্শিয়াঙের সেন্ট আলফান্সো স্কুল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন। উচ্চশিক্ষার জন্য যান বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে। সেখানে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। তারপর নেপালের কাঠমাণ্ডুতে ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটেড মাউন্টেন ডেভলপমেন্ট-এ ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল পদে আসীন হন। তারপর জেবি পন্থ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হিমালয়ান এনভায়রনমেন্ট-এর সিকিম রিজিওনাল সেন্টারের মুখ্য গবেষকের দায়িত্ব সামলান। এছাড়াও তিনি ইন্ডিয়ান সায়েন্স অ্যাকাডেমির একজন অন্যতম গবেষক। দিল্লির টেরি ইউনিভার্সিটির উপাচার্য পদও তিনি সামলেছিলেন। বর্তমানে তিনি উত্তরাখণ্ডের জেবি পন্থ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হিমালয়ান এনভায়রনমেন্ট-এর সায়েন্টিফিক অ্যাডভাইসরি কমিটির চেয়ারপার্সনের পদে রয়েছেন।

৪০ বছর ধরে পার্বত্য এলাকায় বাস্তুতন্ত্র ও জীববৈচিত্র্যের

ওপর গবেষণা চালিয়েছেন দার্জিলিঙের বাসিন্দা একলব্য শর্মা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে সামগ্রিক বাস্তুতন্ত্রের বিকাশ ঘটানো যায়, তা নিয়ে তিনি ছিলেন. গবেষণারত। এরই স্বীকৃতি স্বরূপ পেলেন পদ্ম সম্মান। পূর্ব হিমালয় অঞ্চলে জীবভূরাসায়নিক চক্র, পরিবেশ সংরক্ষণ, সুষম বিকাশ, প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করে জনজাতি সম্প্রদায়ের উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে ৮টি দেশের সহযোগিতায় কাজ করে চলেছেন তিনি। দ্য ইউনাইটেড নেশনস্ ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ, কনভেনশন অন বায়োলজিকাল ডাইভার্সিটি, সাস্টেনেবল্ ডেভেলপমেন্ট গোলস্-এর মতো শীর্ষ আন্তর্জাতিক সংগঠন সমূহের সঙ্গে যুক্ত এই বরেণ্য বিজ্ঞানী পরিবেশ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক স্তরে গৃহীত অসংখ্য নীতি প্রণয়নের বিষয়ে অন্যতম পরামর্শদাতা। নাইট্রোজেন ফিক্সেশন থেকে ওয়াটারশেড ম্যানেজমেন্টের মতো বিভিন্ন বিস্তারিত বিষয় নিয়ে কাজ করে চলা ড. শর্মা বলেন, 'হিমালয়ের বাস্তুতন্ত্র নিয়ে আমি কাজ করি। সিটিজেন রিসার্চার তৈরির জন্য এই ধরনের জনসচেতনতা প্রয়োজন। জনসচেতনতা তৈরির জন্য এই স্বীকৃতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হবে বলেই আশা করছি'। কালিম্পং থেকে কর্মজীবন শুরু তাঁর। তারপর হিমালয়কে ঘিরে দেশ-বিদেশ জুড়ে তাঁর গবেষণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। তাঁর কর্মজীবনের প্রথম লগ্ন থেকে যাঁরা তাঁর সঙ্গী ছিলেন, তাঁদের সকলের সঙ্গে এই সম্মান প্রাপ্তির গৌরব ভাগ করে নিতে চাইছেন ড. একলব্য শর্মা। ■

মরণোত্তর পদ্মভূষণ সম্মান পেলেন সত্যব্রত মুখোপাধ্যায় (জলুবাবু)

শুধু জেলার রাজনীতি নয়, সর্বভারতীয় স্তরেও খ্যাতি সম্পন্ন, নদীয়ার দুঁদে রাজনীতিবিদ সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়ের মরণোত্তর পদ্মভূষণ সম্মানে জেলায় খুশির হাওয়া। জেলার মানুষ তাঁকে জলুবাবু বলেই চেনেন। পেশায় তিনি ছিলেন আইনজীবী। জলুবাবু অবিভক্ত বাঙ্গলার সিলেটে জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সম্পূর্ণ করে লন্ডনে ব্যারিস্টারি পড়তে যান এবং লিঙ্কনস্ ইন থেকে বার-অ্যাট-ল' ডিগ্রি লাভ করেন।

রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে প্রবেশের আগে তিনি ভারতের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল ছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত ২০২৩ সালে প্রয়াত নদীয়া জেলার এই প্রাক্তন রাজনীতিবিদ নিজের হাতে পদ্মভূষণ সম্মান গ্রহণ করতে পারবেন না। জেলাবাসীদের বক্তব্য, জলুবাবুকে যোগ্য সম্মান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তিনি জীবিত অবস্থায় এই পুরস্কার পেলে আরও ভালো হতো। ১৯৯৯ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের ভারতীয় জনতা পার্টির সাংসদ ছিলেন তিনি। সাংসদ হওয়ার পাশাপাশি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর মন্ত্রীসভায় সামলেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পদ। বাজপেয়ীজীর মন্ত্রীসভায় কেন্দ্রীয় সার ও রসায়ন মন্ত্রক ছাড়াও শিল্প-বাণিজ্য মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্বও পালন করেন। নদীয়া জেলার সমকালীন রাজনৈতিক ইতিহাসে জলুবাবুর গুরুত্ব অপরিসীম। বিজেপি থেকে বিরোধী রাজনীতি — সব দলের সদস্য-সমর্থকদের কাছেই জলুবাবুর গ্রহণযোগ্যতা ছিল তুঙ্গে। সকলের কাছেই তিনি ছিলেন সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র। ২০০৮ সালে তিনি রাজ্য বিজেপি-র সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মরণোত্তর পদ্মভূষণ প্রাপক হিসেবে সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানালেন বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। গত ২৬ জানুয়ারি এক্স হ্যান্ডেলে সুকান্তবাবু লিখেছেন, 'প্রয়াত শ্রী সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়কে স্মরণ করা হচ্ছে মরণোত্তর পদ্মভূষণ পুরস্কারে ভূষিত হওয়ার জন্য, জনসাধারণের জন্য তাঁর অনুকরণীয় অবদানের জন্য। তাঁর অসামান্য কাজ সর্বদা স্মরণ ও লালিত হোক।' ■

ফঃ ৪

মরণোত্তর পদ্ম পুরস্কার প্রাপক ছৌ নাচের মুখোশ শিল্পী নেপালচন্দ্র সূত্রধর

ছৌ নাচের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পুরুলিয়া জেলা। ছৌ নাচের মুখোশ তৈরির জন্যও এই জেলা বিখ্যাত। পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডির চড়িদা গ্রাম হলো ছৌ নাচের মুখোশ তৈরির আঁতুড়ঘর। বছরের পর বছর ধরে মুখোশ তৈরি করে আসছেন এই গ্রামের শিল্পীরা। বংশ পরম্পরায় চলছে এই গ্রামের মুখোশ শিল্প। এবার সেই গ্রামেই এল পদ্ম পুরস্কার। এই চড়িদা গ্রামেরই মুখোশ শিল্পী ছিলেন নেপালচন্দ্র সূত্রধর। ছৌ নৃত্যের সঙ্গে ছৌ মুখোশ তৈরিতেও তাঁর জুড়ি মেলা ভার। গোটা জীবনটাই সঁপে দিয়েছিলেন মুখোশ তৈরির কাজে। একের পর এক চোখ ধাঁধানো মুখোশ তৈরি করে গিয়েছেন তিনি। ২০২৩ সালের নভেম্বরে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন নেপালচন্দ্র সূত্রধর। ছৌ নাচের খ্যাতনামা মুখোশ শিল্পীকেই মরণোত্তর পদ্ম পুরস্কার প্রদান করলো কেন্দ্রীয় সরকার। ২০২৪ সালে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হলেন তিনি।

প্রায় পাঁচ দশক ধরে ছৌ নাচের মুখোশ তৈরি করেছেন এই শিল্পী। ৮ বছর বয়সে মুখোশ তৈরির হাতেখড়ি। পরিবারে তিন পুরুষ ধরে তাঁরা মুখোশ তৈরির কাজেই যুক্ত। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে বহু কর্মশালায় যোগ দিয়ে মুখোশ গড়ার প্রশিক্ষণও নিরলসভাবে দিয়ে গিয়েছেন তিনি। মরণোত্তর এই সম্মানের খবর ছড়িয়ে পড়তেই উচ্ছ্বসিত চড়িদা গ্রাম। নেপালচন্দ্র সূত্রধরের নাতি জয়ন্ত সূত্রধর বলেন, ‘দাদু জীবিত অবস্থায় এই সম্মান পেলে আরও আনন্দিত হতাম’। ছৌ নাচের শিল্পী থেকে পর্যটক-সহ বহু মানুষ এই চড়িদা গ্রাম থেকেই মুখোশ সংগ্রহ করেন। ছৌ নৃত্যের প্রতি নেপালবাবুর এই অবদান অবশেষে স্বীকৃতি পেল। সেই গ্রামেরই শিল্পীর মুকুটে এবার মরণোত্তর পদ্ম পুরস্কারের পালক। নেপালবাবুর কন্যা কল্যাণী সূত্রধরের মনে এক মিশ্র অনুভূতি। প্রয়াত পিতার এই স্বীকৃতিতে আবেগাপ্লুত হলেও, নেপালবাবু এই স্বীকৃতি দেখে যেতে পারলেন না, সেই আক্ষেপও রয়েছে তাঁর মনের কোণায়। তিনি বললেন, ‘বাবার এই স্বীকৃতিতে আমরা খুব খুশি আজ। বাবা যদি দু'মাস আগে মারা না যেতেন, তাহলে আরও বেশি আনন্দ হতো। সেই ছোটো থেকে দেখছি, বাবা মুখোশের কাজ করে আসছেন। বিদেশেও যেত তাঁর কাজ। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতেন তিনি। বাবা আজ নেই। তাই কান্নাও পাচ্ছে’। ছৌ নৃত্য ও ছৌ মুখোশ নিয়ে নেপালচন্দ্র সূত্রধর গোটা জীবন ধরে যে কাজ করে গিয়েছেন, সেই স্মৃতিগুলোই আঁকড়ে ধরে থাকতে চান তাঁর পরিবারের সদস্যরা।

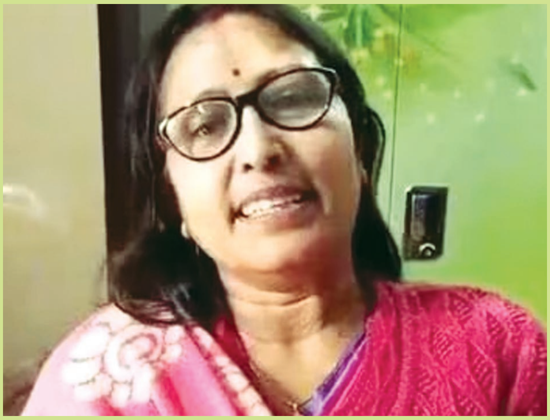

পদ্ম সম্মান প্রাপ্তিতে আবেগ বিহ্বল ভাওয়াইয়া শিল্পী গীতা রায়বর্মন

কোচবিহারের মাটির গান ভাওয়াইয়া। এই গানের সুর জেলার আকাশে বাতাসে। এই প্রথম ভাওয়াইয়া লোকগানের কোনো শিল্পী পদ্ম পুরস্কার পেলেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই খুশির জোয়ার এই জেলার শিল্প মহলে। কোচবিহারের মাথাভাঙ্গা শহরের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা গীতা রায়বর্মন। ছোটোবেলা থেকেই ভাওয়াইয়া গানের হাতে খড়ি। ধীরে ধীরে শিল্পী হয়ে ওঠা। ১৯৯৭-’৯৮ সালে রাজ্য ভাওয়াইয়া উৎসবে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। গত ৩০ বছরের বেশি সময় ধরে আকাশবাণীর শিল্পী। বর্তমানে রেডিয়ো-র ‘এ’ গ্রেড শিল্পী তিনি। দুই পুত্রের মা। স্বামী মনোরঞ্জন বর্মন পেশায় স্কুল শিক্ষক। পদ্মশ্রী পুরস্কারে সম্মানিত হওয়ার খবর শুনে উচ্ছ্বসিত গীতা। ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীকে। প্রতিদিন তাঁর বাড়িতে শুভেচ্ছা জানাতে হাজির পরিচিত ও শুভানুধ্যায়ীরা। ভাওয়াইয়া গানের উৎসস্থল রংপুর। পূর্ববঙ্গের উত্তরাঞ্চলে গোরুর গাড়িতে চলাচলের প্রচলন ছিল বেশি। গোরুর গাড়ির গাড়োয়ান রাত্রে গাড়ি চালানোর সময় যে গান গাইতেন, তার সুর ও ভাবের মধ্যে স্বকীয়তা ছিল। সেটাই ধীরে ধীরে রূপ নেয় একটা ঘরানার। পশ্চিমবঙ্গে ভাওয়াইয়া বেশি প্রচলিত কোচবিহার ও অসমের গোয়ালপাড়ায়।

খবর পাওয়ার পর শরীর কাঁপছিল, এত বড়ো একটা সম্মান কোনোদিন পাবেন ভাবেননি তিনি— পদ্ম সম্মান পাওয়ার কথা শুনে প্রথম প্রতিক্রিয়া ৪৮ বছর বয়সি গীতার। লোক-সংস্কৃতির জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এই শিল্পী বললেন, এই গানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই তাঁর লক্ষ্য। নতুন নতুন ছেলে-মেয়েরা এই গানকে বাঁচিয়ে রাখবে এটাই চান মনে প্রাণে। সরকারকে এই ব্যাপারে এগিয়ে আসার আবেদন করবেন। এই পুরস্কার পাওয়ার পর ধন্যবাদ জানিয়েছেন তাঁর সংগীত শিক্ষাগুরুদের। তাঁদের জন্যই এই সাফল্য, বললেন ভাওয়াইয়া শিল্পী।

‘পদ্ম সম্মানে ভূষিত এক প্রতিস্পর্ধার শিহরণ’ মিঠুন চক্রবর্তী

দোলন ঘোষ।। ছ’ ফুট লম্বা, পঞ্চানন ব্যায়াম সমিতিতে ব্যায়াম করা ছেলেটি ততদিনে আরব সাগরের বাতাস থেকে দুবেলা দু’মুঠোর সংস্থান করে নিতে পারলেও রাতে দু’চোখের পাত এক করার মতো এক চিলতে আশ্রয় মেলেনি। মেডিক্যাল কলেজে কোনো বন্ধুর সুবাদে ঘড়ির কাঁটা ধরে গভীর রাত থেকে ভোর ছ’টা— এই সময়টুকু মিলেছিল শ্রান্ত শরীরটাকে এলিয়ে দেবার আশ্রয়; আর তার জন্য নিত্য টপকাতে হতো হস্টেলের পাঁচিল। এভাবেই বা ক’দিন চলে, কোনোমতে ৭৫ টাকা মসিক ভাড়ায় একটা ঘরে রাতে মেঝেতে শোবার ব্যবস্থা হলো, করণ ওপরে তক্তপোশে যে শোয়, তার রেস্ত বেশি। সে দেড়শো টাকা দেয়। অগত্যা মিঠুন মেঝেতেই। একদিন রাতে একটা বড়ো ইঁদুর কামড়ে দিল। সেদিন আর বেরোতে পারলেন না। শরীরটা চলছিল না। বিছানার লোক কাজে বেরিয়ে গেলে মিঠুন উঠে শুয়েছিলেন তাঁর শয্যায়। সে লোকটি এসে যখন দেখেছিল, অকথ্য তিরস্কার শুরু করেছিল এবং বারবার উল্লেখ করেছিল, ‘তুমি পঁচাত্তর টাকা দাও, কেন তুমি বিছানায় শোবে’। এই অভিজ্ঞতাটা হজম করা শতকরা ৯০ ভাগের পক্ষেই দুষ্কর হতো। ওই অসুস্থ শরীরে বিষের মতো লেগেছিল কথাগুলো।

কিন্তু সেই বিষ...না, হজম করেননি তিনি, কণ্ঠে রেখে দিয়েছিলেন। উগরে দিলেন ‘অগ্নিপথ’-এ। উত্তর কলকাতার ঘুপচিতম গলি মথুর সেন গার্ডেন লেন থেকে সত্তরের উত্তাল সময়ে বম্বে পালানো ছেলেটি তখন থেকে বুঝতে শুরু করে দিয়েছে যে ‘মিলতা হ্যায় ইয়াঁহা সবকুঝ, এক মিলতা নেহী দিল’। তাই জীবনের যাবতীয় হলাহলকে কর্ম দিয়ে অমৃতে বদলে দিতে পারলে, তবেই তুমি হিরো। তাই প্রথম শ্রেণীর মিডিয়াহাউসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, দেবাদিদেবকেও একজনের উপাসনা করতে হয়, তা হলো ‘কর্ম’। মিঠুন মানেই কি উইপিডিয়া বা আই এম ডি বি মিলিয়ে ‘ডিস্কো ডান্সার’, ‘প্রেম প্রতিজ্ঞা’, ‘প্যার ঝুকতা নেহী’, ‘মর্দ’, ‘ত্রয়ী’, ‘গঙ্গা যমুনা সরস্বতী’ ‘জাগ উঠা ইনসান’ ‘এম এল এ ফাটাকেস্ট’ ‘তাহাদের কথা’, ‘প্রজাপতি’ ইত্যাদি অসংখ্য ছবির পরিসংখ্যান? চলচ্চিত্রবেত্তার কাছে তা হতেই পারে... কিন্তু বাঙ্গালির কাছে মিঠুন মানেই তো এক যুদ্ধজয়ী বীর। রূপকথার নায়ক, এক প্রতিস্পর্ধা। অমিতাভ যখন বম্বের অবিসংবাদিত ‘Angry Young Man’ সে সময়ই যেন সেই এই। conization-কে নিঃশব্দ চ্যালেঞ্জ জানিয়ে পাশে ছায়ার মতো এসে দাঁড়ান জোড়াবাগানের গৌরাঙ্গ। জোড়াবাগান থেকে বম্বে, উটি বা মনার্ক-মিঠুন এক স্বপ্নারোহনের হাতছানি। সেই মিঠুন এবার পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হলেন।

পপসম্রাজ্ঞী ঊষা উথুপ পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত

পরিপাটি করে পরা শাড়ি। খোপায় তাঁর তাজা ফুলের মালা। হাতভরা চুড়ি। কপালে বড়ো টিপ। বর্ণনা শুনে একজনেরই নাম গত পাঁচ দশক ধরে মনে করতে পারে গোটা দেশ। তিনি ঊষা উথুপ। সংগীত জগতে তাঁর অবদানের জন্য এই বছর পদ্মভূষণ সম্মানে তিনি ভূষিত।

১৯৪৭ সালে চেন্নাইতে জন্ম এই সংগীত শিল্পীর। তবে স্কুল জীবন মুম্বইয়ে। তিনি যে প্রথাগত ভাবে গানের নোটেশন শেখেননি, সে নিয়ে অবশ্য আক্ষেপ করেছেন প্রবীণ এই সংগীত শিল্পী। তাতে অবশ্য দমবার পাত্রী ছিলেন না তিনি। এই না-শেখা, অধরা বিষয়গুলোই নতুন আঙ্গিকে সংগীত পরিবেশনে উদ্বুদ্ধ করে গিয়েছে তাঁকে।

চেন্নাইয়ের নাইট জেমস্ নাইটক্লাবে গানের মাধ্যমে তাঁর সংগীত জীবনের সূত্রপাত। তারপর, কলকাতায় পদার্পণ। ট্রিঙ্কাসে তাঁর গান জনপ্রিয়তা অর্জন করে। দিল্লির ‘দ্য ওবেরয়’-এ গান করার সুবাদে আসে বলিউড যাত্রার সুযোগ। বলিউড তারকা শশী কাপুর তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন সুর সম্রাট আর ডি বর্মনের। তারপর, ১৯৭১ সালে মুক্তি পাওয়া হিন্দি ছবি ‘কভি ধূপ, কভি ছাঁও’-তে আসে প্লে-ব্যাকের সুযোগ। ঊষাদির গাওয়া প্রথম গানে অন-স্ক্রিন পারফর্ম করেছিলেন হেলেন ও দারা সিংহ। তাঁর কণ্ঠে যে নারীসুলভ পেলবতার পরিবর্তে অন্য মাধুর্য রয়েছে, সে কথা বুঝতে শুরু করেছিলেন। সেই কণ্ঠস্বর. শুনতে ট্রিঙ্কাসে আসতেন পরিচালক সত্যজিৎ রায়। সেই কণ্ঠস্বর যা বিশিষ্ট সুরকার ইলাইয়া রাজা ও এ.আর রহমানের সৃষ্টিতেও প্রাণ এনে দিয়েছে। সেই কণ্ঠস্বরে মাতোয়ারা হয়েছেন দেশের বহু মানুষ। তাঁর সঙ্গে কলকাতার যোগের কথা কখনও ভোলেননি ঊষা। কেরলের বাসিন্দা জনি চারকো উথুপের সঙ্গে বিয়ের পর কোচিতে নিজেদের বাড়ির নাম রেখেছিলেন ‘ট্রিঙ্কাস’। ১৭টি ভারতীয় ও ৮টি বিদেশি ভাষায় সংগীত পরিবেশন করে গড়েছেন এক অনন্য রেকর্ড। আজ তাঁর পদ্মভূষণ সম্মানে সম্মানিত পশ্চিমবঙ্গও। রাষ্ট্রীয় সম্মান পেয়ে প্রবীণ সংগীত শিল্পীর প্রতিক্রিয়া, ‘এতটাই আপ্লুত যে ঠিকভাবে সেটা প্রকাশও করতে পারছি না। ৫৪ বছর ধরে আমার গানকে ভালোবাসার জন্য সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। নিদের মানুষ নিজের দেশের সরকার যখন আপনাকে স্বীকৃতি দেয়, তখন অন্য রকম আনন্দ হয়। বলতে চাই, আগামী প্রজন্মের কাছে যেন অনুপ্রেরণা হয়ে উঠতে পারি। কঠোর পরিশ্রম করলে স্বপ্ন নিশ্চয়ই বাস্তবায়িত হবে’।

“আমাকে ‘পদ্মশ্রী’ সম্মান দিয়ে উপকৃত সমাজকেই সম্মানিত করেছে কেন্দ্রীয় সরকার”—ড. নারায়ণ চক্রবর্তী

বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন ভগিনী নিবেদিতা। জগদীশচন্দ্র তখন আধুনিক পদার্থবিদ্যার মৌলিক গবেষণায় ব্যস্ত। আগেই শুনেছেন তাঁর বেতার সংকেত আবিষ্কারের কথা। জেনেছেন তাঁর বৃক্ষের মধ্যে প্রাণস্পন্দন খুঁজে পাওয়ার সেই উত্তেজক বিজ্ঞানের খুঁটিনাটি। নিবেদিতা রীতিমতো উত্তেজিত। এক অচেনা অজানা বিজ্ঞানসাধক জগদীশচন্দ্রকে সেই তখন থেকেই তুলে ধরেছেন আন্তর্জাতিক পত্রপত্রিকায়।

বিজ্ঞানী ড. নারায়ণ চক্রবর্তীর পাশে এমন কোনো নিবেদিতা ছিলেন না। তিনি বিশ্ববিজ্ঞানের আসরে ঠাঁই কেড়ে নিয়েছেন তাঁর নিজস্ব মেধা এবং উচ্চশিক্ষিত পিতার শিক্ষানুরাগের পরম্পরার টানেই। দীর্ঘ চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে পানীয় জলে ও খাদ্য সামগ্রীতে আর্সেনিকের বিষক্রিয়া এবং ওই বিষক্রিয়ার প্রতিরোধ ও চিকিৎসা নিয়ে তাঁর কার্যকরী গবেষণা বিশ্বচিকিৎসার দরবারে পথপ্রদর্শক হিসেবে স্বীকৃত। তাঁর সম্পাদিত এবং বিশ্বের বহু নামি দামি বিজ্ঞান সাধক ও বিজ্ঞানাচার্যদের আর্সেনিক বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত বই Arsenic Toxicity : Prevention And Treatment অতি যত্নে প্রকাশ করেছে বিখ্যাত মার্কিন প্রকাশনা সংস্থা সিআরসি প্রেস টেলর ও ফ্রাসিস গ্রুপ। এবার তাঁর অবদানের স্বীকৃতি দিল ভারত সরকার। চলতি বছরে ড. নারায়ণ চক্রবর্তী জিতে নিলেন মহাসম্মান ‘পদ্মশ্রী’ পুরস্কার।

কলকাতার মৌলানা আজাদ কলেজে অতিথি অধ্যাপক হিসেবে ২৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে জীববিদ্যা বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন কৃতিত্বের সঙ্গে ড. চক্রবর্তী। পশ্চিমবঙ্গ জৈব ও প্রযুক্তি উন্নয়ন নিগমে দীর্ঘকাল তিনি পরামর্শদাতা ও নির্দেশক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এসবের বাইরেও করোনা ভাইরাসের অতিমারির সময় তিনিই প্রথম ইউটিউব চ্যানেলে এই ভাইরাসের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করে জনমানসে ছড়িয়ে পড়া ভয় ও বিকৃতি সরাতে যে ভূমিকা পালন করেছিলেন, তা ছিল তুলনাহীন। সে সময় তিনি নিয়মিতভাবে দৈনিক ‘সুখবর’ পত্রিকায় এ বিষয়ে যে সব প্রবন্ধ লিখেছিলেন এবং জনসাধারণের চোখে এই ভাইরাসকে ঘিরে কীভাবে মিথ্যাচার ছড়িয়ে অনৈতিকভাবে ব্যবসার ফাঁদ পাতা হচ্ছে, কীভাবে মৃতদেহের অসম্মান করা হচ্ছে এবং মৃত্যুর ২৪ ঘণ্টা পর যে মৃতদেহগুলির মধ্যে ভাইরাস আর বেঁচে থাকে না, সেই তথ্য ও তত্ত্ব প্রচার করে মানুষের মধ্যে সরকারি ও বেসরকারিভাবে প্রোথিত ধারণাগুলিকে নস্যাৎ করেছিলেন। এই সময়েই নলেজ পাবলিশিং কোম্পানি থেকে প্রকাশিত তাঁর বই ‘করোনা অতিমারির ইতিহাস’ জনমানসে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং তাঁরই লেখা প্রবন্ধগুলির সূত্রে কলকাতা হাইকোর্ট তাঁর প্রচারিত তত্ত্ব ও তথ্যকে মান্যতা দেয়।

—‘কেমন লাগছে পদ্মশ্রী সম্মান পেয়ে?’

—‘পুরস্কার পেতে কার না ভালো লাগে! আমারও ভালো লেগেছে। তার চেয়ে ভালো লেগেছে এটা ভেবে যে আমার দীর্ঘদিনের গবেষণা আজ মানুষকে সুস্থ জীবনযাপনের পথ দেখাচ্ছে।’

—‘আগামী দিনে কোনো সরকারি বা বেসরকারি গবেষণায় যুক্ত হবার ইচ্ছে আছে?’

—‘বয়স তো বাড়ছে। তবু যদি কোনও অফার পাই, অবশ্যই করব। আমি পেশাদারি কাজের মানুষ। কাজের সুযোগ সম্মানজনক ভাবে পেলে অবশ্যই করব সমাজের স্বার্থে, মানুষের স্বার্থে। আমার পদ্মশ্রী সম্মানও তো সেই সমাজ ও মানুষকে সম্মান জানানোরই প্রতীক।’

সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে লিখেছেন
প্রবীণ সাংবাদিক সুজিত রায়

নদী থেকে দেবী
মা সরস্বতী

ড. কৃষ্ণকান্ত সরকার

ঋগ্বেদের নির্দেশ রয়েছে সরস্বতী আরাধনায়— 'হে বশিষ্ঠ! তুমি নদীগণের মধ্যে বলবতী সরস্বতীর উদ্দেশে বৃহৎ স্তোত্র, গান কর, দ্যাবাপৃথিবীতে বর্তমানা সরস্বতীকেই দোষ বর্জিত স্তোত্রদ্বারা পূজা কর' (ঋগ্বেদের ঋষি বশিষ্ঠ, ৭.৯.৬.১)।

এই সূক্ত থেকে জানা যায় ঋগ্বেদের সময়ে সব থেকে বলবতী নদী ছিল সরস্বতী। যদিও ভৌগোলিক কারণে ছ' হাজার বছর আগে সেই সরস্বতী নদী বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তবুও আজও কেন আমরা সেই সরস্বতী দেবীমূর্তির পূজা প্রতি বছরই করছি? কেবল নদ-নদীর স্তবস্তুতি পূজাই নয়, হিন্দুরা অগ্নি, বায়ু, সূর্য, মাটি, জল, অরণ্য, গোরু প্রভৃতি প্রকৃতির বহু রূপ ও শক্তিকে দেব-দেবীরূপে পূজা করেন। হিন্দুধর্মে এই প্রকৃতি পূজার তাৎপর্য মোটেই বোঝা যাবে না যদি আমরা মানবজাতির বিবর্তনের কারণ ও ইতিহাস না জানি। মানব সভ্যতার বিকাশে আগুনের বিরাট বৈপ্লবিক ভূমিকা ছিল বলেই বৈদিক ঋষিরা অগ্নিকে বসালেন প্রথম দেবতার আসনে। ঋগ্বেদ শুরু অগ্নি দেবতার স্তুতি করে। তাই আজও হিন্দুদের সব শুভকাজে প্রদীপ প্রজ্বলনের রীতি।

আগুনের ব্যবহার শুরু হলেও মানুষ শস্য উৎপন্ন করতে অক্ষম ছিল। তাই অন্ন সংস্থানের অনিশ্চয়তার কারণে মানুষ ছিল যাযাবর। নদী তার উপকূলে সৃষ্টি করত বুনোশস্য, ফলমূল। সেখানে শিকারেরও সুযোগ ছিল, ছিল পানীয় জল। মানুষ স্থির হোক, সুখে থাকুক, নদীর কি এই ইচ্ছাই ছিল? নদীই মানুষের জন্য খাদ্য সংস্থানের স্থায়ী ব্যবস্থা করেছিল। একই কারণে নদীর উপকূলে স্থায়ী জনবসতি শুরু হয়েছিল। সরস্বতী নদীতে এমন ভয়ংকর বন্যা হতো যা দেখে ঋষি ভরদ্বাজ বলেছেন, 'উভয়কূলনাশিনী' (ঋ ঃ ৬/৬১/২)। ঋষির প্রার্থনা, 'হে সরস্বতী! তুমি আমাদের হীন করিও না। অধিক জলদ্বারা আমাদের উৎপীড়িত করিও না। তুমি আমাদের বন্ধুত্ব ও গৃহ স্বীকার কর। আমরা যেন তোমার নিকট হইতে অপকৃষ্ট স্থানে গমন না করি' (ঋ ঃ ৬/৬১/১৪)। যদিও বন্যার জন্য ছিল খুব দুঃখকষ্ট কিন্তু সরস্বতীর উপকূল ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার ইচ্ছা কারুরই ছিল না।

নদীকূলই ছিল একমাত্র উৎকৃষ্ট স্থান এবং পরোক্ষভাবে বন্যাই ছিল আশীর্বাদ। বন্যার মাধ্যমে সরস্বতী নদী প্রস্তুত করত উর্বর কৃষি জমি। নদী ও গোরু সরল করল কৃষিকাজ। গোরু মানুষের জন্য করেছে অক্লান্ত পরিশ্রম, তারাই কৃষিকাজ সফল করেছিল। কৃতজ্ঞতায় গোরুকে মানুষ বসাল দেবতার আসনে। প্রাচীন ভারত ও মিশর নদী ও গোরুকে এই কারণে দেবতা করেছিল।

'হে অন্নসম্পন্না সরস্বতী দেবি! তুমি মানবগণকে ভূমিপ্রদান করিয়াছ'— একথা উচ্চারিত হলো ঋষি ভরদ্বাজের কণ্ঠে (ঋ ঃ ৫/৬১/৩)। ঋষির প্রার্থনা 'হে সরস্বতি! তুমি আমাদিগকে প্রশস্ত ধনে লইয়া যাও' (ঋগ্বেদ ঃ ৬/৬১/১৪)। 'দানশালিনী অন্ন সম্পন্না... সরস্বতী যেন অন্নদ্বারা সাম্যকরূপে অমাদিগের তৃপ্তি সাধন করেন' (ঋ ঃ ৬/৬১/৪)। মায়ের মতোই সরস্বতী নদী সকলকে অন্ন দান করলেন। তাই সরস্বতী নদী হলেন মা সরস্বতী। এই নদীর জন্যই এমনই ফসলের প্রাচুর্য হয়েছিল যার ফলে নহুস ও চিত্র এই দুই রাজার অতি সম্পদশালী দুইটি রাজ্য গড়ে উঠেছিল সরস্বতীর উপকূলে। নিষাদ-সহ পাঁচ জাতির 'সমৃদ্ধিবিধায়িনী সরস্বতী' হয়ে উঠলেন সকলের পূজ্য (ঋগ্বেদ ৬/৬২/১২)।

সরস্বতী নদীর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান রয়েছে মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধনে। প্রত্নতাত্ত্বিক ড. রফিক মুঘল লিখেছেন, 'প্রাগৈতিহাসিককালে সরস্বতী উপকূলে মানুষের বসতির ধাঁচ ছিল খুব বেশি শান্ত। সরস্বতীর জন্যই সেই শান্ত পরিবেশে সৃষ্টি হয়েছিল আদর্শ বিদ্যাস্থান। সেখানে ঋষিরা যজ্ঞ করতেন, তাদের কণ্ঠে বেদমন্ত্র প্রকাশ হতো। যেমন 'সুনৃত বাক্যের উৎপাদয়িত্রী, সুমতি মানুষদের শিক্ষয়িত্রী, সরস্বতী আমাদের যজ্ঞ গ্রহণ করেছেন।' 'সুনৃত'— অর্থ সত্য। সরস্বতী উপকূলেই ঋগ্বেদ সৃষ্টি হয়েছে। বেদ অর্থ সত্য জ্ঞান যা আজও বিশ্বব্যাপী পূজিত। 'সরস্বতী সকল জ্ঞান উদ্দীপন করিয়াছেন' (১.৩.২৩)। ঋষির প্রার্থনা— 'কল্যাণী সরস্বতী আমাদের প্রজ্ঞা উৎপাদন করুন। এই ভাবে সরস্বতী জ্ঞান ও বিদ্যার দেবী হলেন। যে সব মন্ত্র ঋষিকণ্ঠে উচ্চারিত হতো 'ক্রমে সেই সরস্বতী নদী সেই পবিত্র মন্ত্রের দেবী ও বাগদেবী বলে পরিণত হলেন'। গৃৎসমদ ঋষির মন্ত্র— মাতৃগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, নদীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, দেবীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হে সরস্বতী! (ঋ ঃ ২/৪১/১৬)। সরস্বতী নদী আজ নেই। কিন্তু সরস্বতী সংস্কৃতি চলছে ছ' হাজার বছর ধরে। শুধু ভারতেই নয়, অন্য অনেক দেশেও। □

বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী

দেবী সরস্বতী

প্রদীপ মারিক

হিন্দু ধর্মের সর্বোচ্চ আসনে থাকা তিন দেবতার অন্যতম হলেন ব্রহ্মা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে নিয়েই ত্রিমূর্তি। পুরাণ অনুসারে ব্রহ্মা হলেন স্বয়ম্ভু। তিনি নিজেই সৃষ্টি হয়েছেন। এই আশ্চর্য জন্মের পর ব্রহ্মা ধ্যানে বসেন। সেই ধ্যানে তিনি তাঁর সকল ভালো গুণকে একত্র করতে থাকেন। আর সকল ভালো গুণ একত্রিত হয়ে তা ধীরে ধীরে এক নারীর আকার নিতে থাকে। এই ভাবেই ব্রহ্মার মুখগহ্বর থেকে সৃষ্টি হয় দেবী সরস্বতীর। ব্রহ্মার প্রথমে একটিই মুখ ছিল। অত্যন্ত সুন্দর সেই দেবীকে দর্শন করার জন্যই ব্রহ্মার আরও তিনটি মুখের সৃষ্টি হয়। ব্রহ্মা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করলেও নিজের সৃষ্টি নিয়ে তিনি খুব একটা সন্তুষ্ট ছিলেন না। সরস্বতী তাঁকে এই বিশ্বকে কীভাবে আরও সুন্দর করে তোলা যায়, সে সম্পর্কে পরামর্শ দেন।

পুরাণ অনুসারে বসন্ত পঞ্চমীতেই দেবী সরস্বতীর সৃষ্টি হয়। সরস্বতীকে সকল বেদের মা বলে মনে করা হয়। সকল শব্দ ও ভাষার উৎপত্তি তাঁর থেকে হয়েছিল বলে ব্রহ্মা সরস্বতীর নাম রাখেন বাগদেবী। পূর্ব ভারতের প্রায় সব রাজ্যে সরস্বতীকে শিব ও পার্বতীর কন্যা বলে মনে করা হয়।

বৌদ্ধ সাহিত্যে সরস্বতীকে মঞ্জুশ্রী নামে আরাধনা করা হয়। বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে আধুনিক যুগ পর্যন্ত হিন্দুধর্মে সরস্বতী একজন গুরুত্বপূর্ণ দেবীর স্থান অধিকার করে রয়েছেন। সরস্বতী সাধারণত দ্বিভুজা বা চতুর্ভুজা মূর্তিতে পূজিতা হন। দ্বিভুজা মূর্তিতে তাঁর হাতে থাকে বীণা ও পুস্তক অথবা কলম ও পুস্তক। চতুর্ভুজা মূর্তিতে থাকে পুস্তক, অক্ষমালা, সুধাকলস ও বীণা অথবা ব্যাখ্যা মুদ্রা, বীণা, সুধাকলস ও পুস্তক, অথবা অক্ষমালা, দুটি শ্বেত পদ্ম ও পুস্তক অথবা পাশ, অঙ্কুশ, বিদ্যা বা পুস্তক ও অক্ষমালা।

হিন্দুধর্মে এই প্রত্যেকটি বস্তুরই প্রতীকী অর্থ রয়েছে। সরস শব্দের আক্ষরিক অর্থ হ্রদ বা সরোবর হলেও এটির অপর অর্থ 'বাক্য'। ব্রতী শব্দের অর্থ 'যিনি অধিষ্ঠাত্রী'। নামটি আদিতে 'সরস্বতী' নামে পরিচিত এক বা একাধিক নদীর সঙ্গে যুক্ত হলেও এই নামটির আক্ষরিক অর্থ তাই হয় 'যে দেবী পুষ্করিণী, হ্রদ ও সরোবরের অধিকারিণী' বা ক্ষেত্রবিশেষে 'যে দেবী বাক্যের অধিকারিণী'। ধ্যানমন্ত্রে বর্ণিত প্রতিমাকল্পটিতে দেবী সরস্বতীকে শ্বেতবর্ণা, শ্বেতপদ্মে আসীনা, মুক্তাহারে ভুষিতা, পদ্মলোচনা ও বীণাপুস্তকধারিণী এক দিব্য নারীমূর্তিরূপে কল্পনা করা হয়েছে।

রামায়ণ রচয়িতা বাল্মীকি যখন ক্রৌঞ্চ হননের শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন, সে সময় জ্যোতির্ময়ী ব্রহ্মাপ্রিয়া সরস্বতী তাঁর ললাটে বিদ্যুৎ রেখার মতো প্রকাশিত হয়েছিলেন।

সরস্ + বতী = সরস্বতী অর্থ জ্যোতির্ময়ী। ঋগ্বেদে ও যজুর্বেদে অনেকবার ইরা, ভারতী, সরস্বতীকে একসঙ্গে দেখা যায়। বেদের মন্ত্রগুলো পর্যালোচনায় ধারণা হয় যে, সরস্বতী হলেন মূলত সূর্যাগ্নি। ঋকবেদে দেবী সরস্বতীকে নদী রূপে কল্পনা করা হয়েছে যিনি প্রবহমান কর্মের দ্বারা বিশালতার অনন্ত সমুদ্রে মিলিত হয়েছেন। সংগীত, শিল্প ও বিদ্যার দেবী হিসেবে তাঁর এক হাতে পুস্তক আর এক হাতে বীণা। তাছাড়া পুরাণ কাহিনি অনুসারে জানা যায় যে শুম্ভ-নিশুম্ভ নামক অসুরকে বধ করার সময় দেবীর যে মূর্তি কল্পনা করা হয়েছিল তা ছিল এই মহাসরস্বতী দেবীর মূর্তি। হিন্দুরা বিদ্যাদেবী বা সরস্বতী দেবীকেই পূজা করে থাকে। দেবীর এক হাতে বীণা থাকার কারণে, এটিকে সংগীতের দেবী বা বীণাপাণিও বলে থকে।

শাস্ত্রমতে সরস্বতী শব্দটির আর এক অর্থ, 'সতত রসে সমৃদ্ধা'। তিনি শুক্লবর্ণা, শুভ্র হংসবাহনা। 'বীণারঞ্জিত পুস্তক হস্তে।' অর্থাৎ এক হাতে বীণা ও অন্য হাতে পুস্তক। সরস্বতীপূজা শুধু শিক্ষার্থী আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই সীমাবদ্ধ থাকে না। এই সরস্বতী দেবী বা বিদ্যাদেবীর পূজা প্রতিটি গ্রামে, প্রতিটি মহল্লায়, প্রতিটি শহরের আনাচেকানাচেই হয়ে থাকে। কারণ, সরস্বতী দেবী বা বিদ্যাদেবী হলেন, জ্ঞানদায়িনী দেবী সরস্বতী। তিনি বিদ্যাজ্ঞান দানকারী দেবী। তিনি মর্ত্যলোকে সকলকে বিদ্যা আর জ্ঞান দান করেন। তাই মানুষ বিদ্বান আর জ্ঞান লভের আশায় সরস্বতী দেবী বা বিদ্যাদেবীর পূজা করে থাকেন।

সরস্বতী দেবীর এক হাতে বীণা অর্থাৎ ছন্দময় জীবন। বীণার ঝংকারে উঠে আসে ধ্বনি। সাধক বিদ্যাদেবী সরস্বতীর সাধনায় সিদ্ধি লাভ করলে বীণার ধ্বনি শুনতে পান। বীণার সুর মধুর। সরস্বতী দেবীর এক হাতে পুস্তক অর্থ বিদ্যার্থীর লক্ষ্য জ্ঞানার্জন। আর সে জ্ঞান ও বিদ্যার্জনের জন্য জ্ঞানের ভাণ্ডার 'বেদ' তাঁর হাতে রয়েছে। 'বেদই বিদ্যা'। তিনি আমাদের আশীর্বাদ করছেন— 'জীবনকে শুভ্র ও পবিত্র কর, সত্যকে আঁকড়ে থাক, মূল গ্রন্থের বাণী পালন কর, জীবন ছন্দময় কর, স্বচ্ছন্দে থাক।' ▯

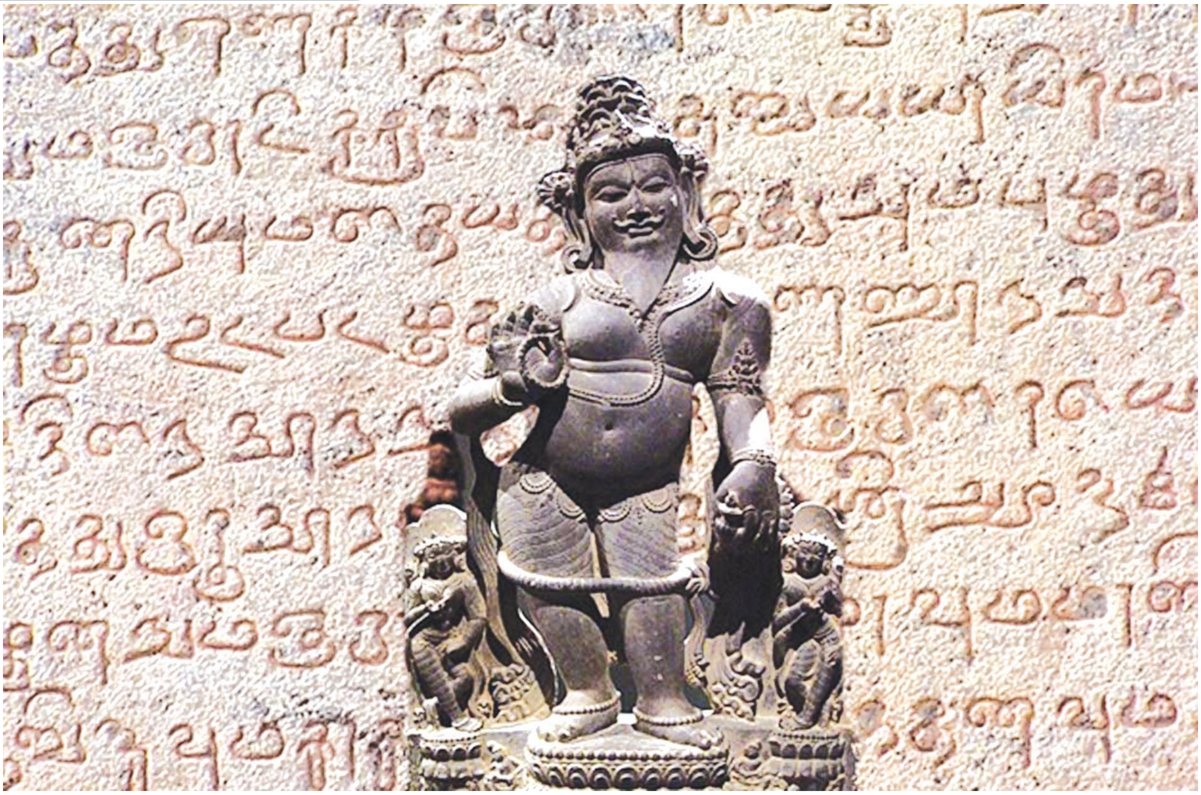

সঙ্গম সাহিত্য এবং সমকালীন দক্ষিণ ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য

নিখিল চিত্রকর

সেই সময় ভারতীয় উপমহাদেশে ধ্রুপদী সাহিত্য, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, নিরাপত্তা— সমস্ত ক্ষেত্রই উৎকর্ষের শিখর ছুঁয়েছে। সেই কালচক্রে প্রাচীন ভারতে চলেছে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত, স্কন্দগুপ্তর মতো সম্রাটদের রাজত্ব। নতুন নতুন আবিষ্কারে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, বাস্তুবিদ্যায় ও শিল্পে একের পর এক কীর্তি স্থাপন করে চলেছেন গুপ্ত সাম্রাজ্যের বর্ণময় শাসকেরা। কালিদাস, আর্যভট্ট, বরাহমিহির, বিষ্ণুশর্মার মতো কিংবদন্তী পণ্ডিতরা পুষ্ট করছেন এদেশের সাহিত্য, গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিস্তার। যাঁদের আবিষ্কারের সুফল ছাড়া বিংশ শতাব্দীর কম্পিউটার নির্ভর মানবসমাজ অচল। সেই সময়ে আনুমানিক ৩০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে দক্ষিণ ভারতজুড়ে সঙ্গম সাহিত্য ধারার বিকাশ ঘটেছিল যা স্থায়ী হয় ৬০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। কারও মতে প্রস্তর যুগের শেষে এই সাহিত্যধারার উন্মেষ ঘটে। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে ৪৭৬ জন কবি ২৩৮১টি কবিতা রচনা করে গেছেন। যার মাধ্যমে প্রাচীন ভারতের সমকালীন সমাজ, অর্থব্যবস্থা, শিল্প ও বাণিজ্য এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বিশদ তথ্য প্রতিফলিত হয়। সঙ্গম সাহিত্যধারায় প্রবাহিত এই সহস্রাধিক বছরের ইতিবৃত্তকে ঐতিহাসিকরা সঙ্গম যুগ বলে অভিহিত করেছেন।

সঙ্গম সাহিত্য রচিত হয়েছিল তামিল ভাষায়। তামিল হলো পৃথিবীর প্রাচীন ভাষাগুলির অন্যতম। এখন প্রশ্ন হলো, প্রাচীন এই তামিল সাহিত্যধারার নাম 'সঙ্গম' কেন? সাধারণত সঙ্গম কথার অর্থ মিলনস্থল। এখানে সঙ্গম বলতে কবি ও পণ্ডিতদের সমাবেশ বোঝানো হয়েছে। কিংবদন্তী অনুসারে প্রাচীন ভারতের তামিল প্রদেশে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ৯৯০০ বছর ধরে তিনটি কবি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বংশ পরম্পরায় জনৈক পাণ্ড্য রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই কবি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই কবি সম্মেলনই দক্ষিণী ভাষায় 'সঙ্গম' নামে পরিচিতি লাভ করে। সঙ্গমে অংশগ্রহণকারী কবিদের রচিত সংকলন সময়ান্তরে 'সঙ্গম সাহিত্য' নামে ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিয়েছে। সঙ্গম সাহিত্যের ধারক ও বাহক ছিলেন তামিল ভাষার কবিরা। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সমাজের বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণীর পুরুষ ও মহিলারা। ১০০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বিভিন্ন সংকলনে গ্রন্থিত ও সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয় প্রাচীন তামিল ভাষার এই সাহিত্যকীর্তি।

প্রথম সঙ্গম অনুষ্ঠিত হয় তেন মাদুরাইয়ে। কন্যাকুমারীর কাছে, ভারত মহাসাগরের

নিকটবর্তী কুমারী নদীর মোহনায়। গবেষকদের মতে তেন মাদুরাইয়ের এই সঙ্গমকে কেন্দ্র করেই গোটা দক্ষিণ ভারতে সঙ্গম সাহিত্যের জোয়ার এসেছিল। পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত বিভিন্ন সংকলনে উল্লেখ রয়েছে, প্রথম সঙ্গমে দেবাদিদেব মহাদেব, কার্তিকেয় প্রভৃতি দেবতা এবং অগস্ত্য মুনির মতো মহর্ষি উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয় সঙ্গমটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল থামিরাবারানি নদীর তীরবর্তী কাবাদপুরম নগরে। অধুনা মাদুরাইয়ে অনুষ্ঠিত হয় তৃতীয় সঙ্গমটি। 'ইরাইয়ানার আগাপ্পুরুল'-এর বিবরণে উল্লেখ পাওয়া যায় যে এই পণ্ডিত ও কারণে প্রাচীন ভারতের সমকালীন বাণিজ্যনীতির প্রতিফলন ঘটেছিল সঙ্গম সাহিত্যের কবিদের লেখায়। সঙ্গম সাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়, সেই সময় তামিল প্রদেশের সঙ্গে রোম ও গ্রিসের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সেই সময় মালাবার উপকূলে 'মুজিরিস' বা 'মুচিরি' এবং 'কাবেরিপত্তিনম' নামে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দরের নাম জানা যায়। অধুনা তামিলনাড়ু এবং কেরালায় প্রত্নতাত্ত্বিক খননের পর রোমের আরেস্তাই মৃৎশিল্প, প্রাচীন গ্রিসের দুই হাতলবিশিষ্ট পানপাত্র এবং অজস্র প্রাচীন জনৈক গ্রিক নাবিকের লেখা 'পেরিপ্লাস অব দ্য এরিথ্রিয়ান সি' এবং পরবর্তীকালে ১৫০ খ্রিস্টাব্দে টলেমির লেখা 'জিওগ্রাফিয়া' গ্রন্থেও সঙ্গম যুগের মুচিরি, কাবেরিপত্তনম বন্দরের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

৬০০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকেই দক্ষিণ ভারতে সঙ্গম সাহিত্যের অস্তিত্ব বিলীন হতে শুরু করে। উইকিপিডিয়ায় প্রকাশিত নিবন্ধে সঙ্গম সাহিত্যের আবিষ্কার সম্পর্কে বলা হয়েছে। উনিশ শতকের শেষের দিকে আরুমুকা নাভালকার, সি ডব্লিউ দামোদরম পিল্লাই এবং ইউভি স্বামীনাথন আইয়ার বিভিন্ন সময়ে সঙ্গম

Palm-leaf manuscript (Sangam literature)

সাহিত্যিকদের সম্মেলনে প্রথম ও দ্বিতীয় সঙ্গমে অংশগ্রহণের পর মহর্ষি অগস্ত্য সঙ্গম সাহিত্যের ব্যাকরণ রচনা করেন। অগত্তীয়ম, তোলকাপ্পিয়াম-সহ বেশ কয়েকটি রচনা তাঁরাই সৃষ্টি। 'তোলকাপ্পিয়াম' গ্রন্থটিকে তামিল ভাষায় রচিত প্রথম ব্যাকরণ এবং ঐতিহাসিকভাবে প্রামাণ্য তামিল ভাষায় লেখা প্রথম রচনা হিসেবে গণ্য করা হয়।

সঙ্গম সাহিত্যের চর্চা থেকে সমকালীন ভারতের কৃষিব্যবস্থা, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, ভৌগোলিক বিস্তার সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। বহু গ্রন্থে সেই সময়ের দক্ষিণ ভারতীয় খাদ্যাভ্যাস, রসনাতৃপ্তি এবং নানাধরনের পদের উল্লেখও রয়েছে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলো তৎকালীন ভারতের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের বৈদেশিক সম্পর্ক।

গবেষকদের মতে সঙ্গম সাহিত্য বৈদিক সাহিত্যের মতো নীতিজ্ঞানমূলক ছিল না। সঙ্গম সাহিত্য ছিল বস্তুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। যে রোমান মুদ্রা পাওয়া গেছে। ঐতিহাসিকদের ধারণা এগুলির নির্মাণকাল প্রথম ও দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দ। মালাবার উপকূলের মুচিরি (অথবা মুজিরিস) বন্দরের উল্লেখ পাওয়া যায় 'অহনানুরু' সংকলনের একটি কবিতায়। সেখানে উদ্ধৃত হয়েছে— 'পেরিয়ারু নদীর সাদা ফেনার উপর ঢেউ তুলে যবনদের সুন্দর সুন্দর জাহাজ এল। তাদের সঙ্গে এলো সোনা। সোনার বিনিময়ে গোলমরিচ বোঝাই করে নিয়ে গেল তাদের দেশে। মুচিরির চারপাশে সেই শব্দ প্রতিধ্বনিত হতে লাগল'। এখানে যবন বলতে বিদেশি রোমান ও গ্রিকদের উল্লেখ করা হয়েছে। পুরাণানুরু সংকলনের একটি লেখায় এই যবনদের প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হয়েছে— 'সুন্দর জাহাজগুলিতে যবনরা মিষ্টি সুগন্ধযুক্ত মদিরা নিয়ে এল, সোনার পেয়ালায় যবনরা রোজ সেই মদিরা পান করত।' প্রাচীন সঙ্গম সাহিত্যের এই রচনাগুলি সেই সময় দক্ষিণ ভারতের উপকূলবর্তী শহরগুলোতে গ্রিক ও রোমানদের উপস্থিত প্রমাণ করে। ৭৫ খ্রিস্টাব্দে সাহিত্যের নিদর্শন খুঁজে পান। তাঁরা তালপাতায় লেখা একটি পুঁথি আবিষ্কার করেন। তামিল ভাষায় গ্রন্থিত এই সংহিতাই প্রাচীন ভারতের সাহিত্যকীর্তি। সঙ্গম সাহিত্য।

তথ্যসূত্র :

• The Illustrated History of South India, from Prehistoric times to the fall of Ijaynagar by K.A. Nilkanta Sastri (Oxford University Press, 2009.

• India's Ancient Past : R.S. Sharma (Oxford university press, 2009)

• সঙ্গম সাহিত্য, শান্তনু ভৌমিক : ইতিহাস, তথ্য ও তর্ক (ইতিহাস আড্ডা ওয়েব ম্যাগাজিন)।

• Google Wikipedia.

সার্বিক ও সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে মোদী সরকারের অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট

রতন কুমার ঘোষাল

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন গত ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের জন্য যে অন্তবর্তীকালীন বাজেট পেশ করলেন তাতে ভারতের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে একটা কাঠামোগত পরিবর্তন ও সুষম উন্নয়নের দিশা সুস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এই বাজেটে পূর্ববর্তী বাজেট, পরিকল্পনা ও উন্নয়নের লক্ষ্যগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভারতের দীর্ঘমেয়াদি আর্থ-সামাজিক কাঠামোগত পরিবর্তনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রগতির হার তরান্বিত করার জন্য একটা দৃঢ় প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যার ফলস্বরূপ সমস্ত স্তরের মানুষজন (মহিলা-পুরুষ, যুবক-যুবতী নির্বিশেষে) সমস্ত আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রগুলি, দেশের সমস্ত অঞ্চল/রাজ্যগুলি বর্তমানে এবং আগামী দিনগুলিতে এই সার্বিক উন্নতির সুফল ভোগ করতে পারবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সরকার প্রথম থেকেই ভারতের অর্থনীতিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে একটা উন্নত দেশে পরিণত করার জন্য কতকগুলি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত করে আর্থিক পরিকল্পনা ও কৌশল গ্রহণ করে চলেছে। যেমন ভারতের প্রকৃত জাতীয় আয়কে পাঁচ-ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছে দেওয়া, আত্মনির্ভর ভারত গঠন করা, সবকা সাথ, সবকা বিকাশ অর্থাৎ এই বৈচিত্র্যপূর্ণ ভারতের সকল মানুষকে সমস্ত অঞ্চলকে, অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্রগুলিকে দ্রুত উন্নয়নে অংশীদার করা প্রভৃতি।

যার জন্য দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১২-২০১৭) একটা প্রধান উদ্দেশ্য তথা কৌশলই ছিল 'স্থিতিযোগ্য দ্রুত সার্বিক ও সুষম অন্তর্ভুক্তিমূলক' (Sustainable fastet Inclusive Development Policy) উন্নয়ন। তারপর থেকে এই সরকারের প্রতিটি বাজেটেই আয় ও ব্যয়ের একটা সুদক্ষ পুর্নবিন্যস্তকরণ কৌশল (Fiscal-Consolidation Policy) লক্ষ্য করা যায়। কোনো বাজেটই তার পূর্ববর্তী বাজেট ও পরিকল্পনাগুলিকে সরিয়ে রেখে তৈরি করা যায় না। কারণ দেশের অর্থনৈতিক বিভিন্ন প্রকল্প শেষ করার একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকে এবং অনেক সময়েই সেগুলি নির্দিষ্ট পরিকল্পিত সময়ের মধ্যে শেষ করা যায় না। ফলত বর্তমান বাজেটেও একদিকে যেমন সেগুলির জন্য কিছু গুরুত্ব দিতে হয় এবং অন্যদিকে ভবিষ্যতের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে সেগুলিকে বাস্তবায়িত করার জন্যও গুরুত্ব দিতে হয়। বর্তমান বাজেটে তারই একটা প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

এবার সংক্ষেপে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন বাজেটকে অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্লেষণ করা যাক। আমরা এই অন্তর্বর্তী বাজেটকে দুটো দিক থেকে বিচার করবো। প্রথমত, এই বাজেটের মূল লক্ষ্যগুলো ও অন্তর্নিহিত দর্শন; দ্বিতীয়ত, বাজেটের প্রধান বিষয় যথা আয় ও ব্যয়ের উৎসগুলি, ক্ষেত্রগুলি ও অর্থবণ্টন ব্যবস্থাগুলি। এই দুটি দিক থেকে বিচার করলে, এই বাজেটের লক্ষ্যগুলি তথা বর্তমান সরকারের মূল উদ্দেশ্যগুলি (যথা— সার্বিক সুষম দ্রুত স্থিতিশীল উন্নয়ন; ও আত্মনির্ভর উন্নত ভারত গঠন) বাস্তবায়নে বর্তমান বাজেট কতটা সংগতিপূর্ণ তা বোঝা যায়।

এই বাজেটের প্রধান লক্ষ্য হলো উন্নততর ভারত তৈরি করা যেখানে প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকাঠামো ও অন্যান্য আধুনিক বৈজ্ঞানিক কৌশলের সমস্তরকম সুযোগ-সুবিধা সকলে সুষমভাবে উপভোগ করতে পারবে। সেজন্য উন্নয়নের মূলমন্ত্র হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে সবকা সাথ, সবকা বিকাশ ও সবকা বিশ্বাস। অর্থাৎ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত অঞ্চলের/রাজ্যের সকল মানুষকে, এই

ফঃ ৫

সামগ্রিক দ্রুত স্থিতিযোগ্য দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন প্রক্রিয়াতে অন্তর্ভুক্তিকরণের মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক মঙ্গল সাধন করা। এই চিন্তনকে মাথায় রেখেই অর্থমন্ত্রী এই অন্তর্বর্তী বাজেট তৈরি করেছেন। এটা থেকে পূর্ণাঙ্গ বাজেটেরও এক রূপরেখা কল্পনা করা আশা করি খুবই সহজ।

বর্তমান বাজেটের মূল মন্ত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সমস্ত স্তরের মানুষের অর্থনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি; সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি, সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, স্বজনপোষণ ও দুর্নীতি কমানো, স্বাস্থ্য, শিক্ষার সুরক্ষা, পরিবেশ দূষণ মুক্ত করা, সমস্ত মানুষের জন্য পরিশ্রুত পানীয় জল, বাসস্থান, জ্বালানি ও রান্নার গ্যাস, সুনিশ্চিত খাদ্য নিরাপত্তার (বিনামূল্যে রেশনের মাধ্যমে) ব্যবস্থা করা, বহুমাত্রিক দারিদ্র কমানোর উপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। এক কথায় এই বাজেটে একটা সামগ্রিক সুষম উন্নয়ন কৌশল গ্রহণের মাধ্যমে অদূর ভবিষ্যতে ভারতকে বিশ্বের অন্যান্য উন্নত দেশগুলির সমকক্ষ করে তোলার একটা ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে ভারতের অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্রগুলিতেই যথা কৃষি, শিল্প, সেবা, কৃৎকৌশল, ভারসাম্যযুক্ত গুরুত্বও যেমন দেওয়া হয়েছে, তেমনি বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলিতে সুষম ব্যয় বণ্টনের দিকেও লক্ষ্য দেওয়া হয়েছে যাতে বর্তমন সরকারের নেতৃত্বে উন্নততর দেশ গঠনের লক্ষ্যে দ্রুত পৌঁছানো যায়।

এবার আসা যাক অন্তর্বর্তী বাজেটের রাজস্ব কাঠামো (আয়-ব্যয়ের) বিশ্লেষণের দিকে। কাঠামোগতভাবে যে কোনো বাজেটেই আয় ও ব্যয়ের দুটো হিসাব থাকে— যথার্থ রাজস্ব খাতের আয় ও ব্যয় এবং (২) মূলধনী খাতে আয় ও ব্যয়। রাজস্ব খাতের আয় হলো কর বাবদ নিট আয় (রাজ্যগুলির অংশবাদে) ও কর বহির্ভূত আয় (সুদ প্রাপ্তি, বিভিন্ন সরকারি ক্ষেত্রের মুনাফা প্রভৃতি)। বর্তমান বাজেটে রাজস্ব খাতে মোট আয় ধরা হয়েছে ৩০ লক্ষ কোটি টাকা এবং ব্যয় ধরা হয়েছে ৩৬.৫ লক্ষ কোটি টাকা। স্বভাবতই রাজস্বখাতে ৬.৫ লক্ষ কোটি টাকা ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। এই খাতে ব্যয়গুলোর মধ্যে রয়েছে প্রতিরক্ষাখাতে ব্যয়, সামাজিক নিরাপত্তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ। বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক ব্যয়, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলগুলিকে অনুদান প্রদান ইত্যাদি। অন্যদিকে বর্তমান বাজেটে মূলধনী খাতে মোট আয় ধরা হয়েছে ১৭.৬ লক্ষ কোটি টাকা এবং ব্যয় ধরা হয়েছে ১৫ লক্ষ কোটি টাকা। স্বভাবতই মূলধনী খাতে উদ্বৃত্ত হচ্ছে ২.৬ লক্ষ কোটি টাকা যা রাজস্ব খাতে ঘাটতি কিছুটা মেটাবে। রাজস্ব খাতের বাকি ঘাটতি মূলধনী খাতে ঋণের মাধ্যমেও মেটানো যায়। আবার বিলগ্নীকরণ করে বা সরকারি সম্পত্তি বিক্রি করে (Distinve stment in Public Enterprise) মেটানো যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দুটি খাতেই পরিকল্পিত ব্যয় ও পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয়ের পার্থক্য বর্তমানে ধরা হয় না। বর্তমান বাজেটে রাজস্ব খাতে ঘাটতির একটি কারণ হয়েছে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি যার পরিমাণ হচ্ছে ৬.২১ লক্ষ কোটি টাকা। তবে এক্ষেত্রে ভালো দিকটা হলো এই ব্যয়ের ২৭.৬৭ শতাংশ ধরা হয়েছে মূলধনী ব্যয় যা গুণক পদ্ধতিতে আয় ও কর্মসংস্থান বাড়াতে সাহায্য করবে। স্বভাবতই এটা রাজস্ব আদায় (কর বাবদ) বাড়াবে। অন্যদিকে সরকারি ঋণের পরিমাণ গতবারের তুলনায় ১৫.৪৩ লক্ষ কোটি টাকা থেকে কমিয়ে এই বাজেটে ১৪.১৩ লক্ষ কোটি ধরা হয়েছে। এক্ষেত্রে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই বাজেটে মোট মূলধনী ব্যয় বাড়ানো হয়েছে ১১ শতাংশ মতো যা বর্তমানে ধরা হয়েছে ১১.১১ লক্ষ কোটি টাকা যেটা আমাদের মোট জাতীয় আয়ের/উৎপাদনের ৩.৪ শতাংশ।

স্বভাবতই এই ব্যয় দেশের অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে মূলধন গঠনের মাধ্যমে উৎপাদিত শক্তি বাড়াবে এবং গুণক পদ্ধতি ক্রমাগত আয় ও কর্মসংস্থান বাড়াবে। স্বভাবতই সরকারের রাজস্বখাতে আয়ও বাড়তে থাকবে। এর পাশাপাশি দেশের আর্থিক ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশের জন্য বিদেশ থেকে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ ব্যয় আরও বাড়বে বলে আশা করা হয়েছে।

ফলত, এই বাজেটে ভারতের প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধি হার ধরা হয়েছে বছরে গড়ে ৭.৩ শতাংশ এবং মোট জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ ধরা হয়েছে ১০.৫ শতাংশ (২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে)। পাশাপাশি রাজস্ব ঘাটতি (Fiscal Deficit) গত বছরের তুলনায় আরও কমিয়ে জাতীয় আয়ের ৫.১ শতাংশে নামানো হয়েছে। এটা সুসংহত রাজস্ব পূর্ণবিন্যস্তকরণের (Ficcal consolidation) দক্ষতার পরিচায়ক এবং তা বর্তমান অর্থমন্ত্রী তাঁর সমস্ত বাজেটেই দেখিয়েছেন। গত বেশ কয়েক বছর ধরে ভারতের অর্থনীতিতে মূলধনী ব্যয় বৃদ্ধির হারের গতি-প্রকৃতি, আর্থিক ঘাটতির গতিপ্রকৃতি, সমাজকল্যাণমূলক ব্যয়ের গতি-প্রকৃতি, বৈদেশিক বিনিয়োগের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাবে ও জাতীয় আয়ের অনুপাতে আর্থিক ঘাটতি (Fiscal Deficit) ও প্রাথমিক ঘাটতি আরও হ্রাস পাবে এবং ভারতের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নতির হার আরও দ্রুততর হয়ে ভারতকে অদূর ভবিষ্যতেই একটা উন্নত দেশে পরিণত করবে।

এবার দেখা যাক বর্তমান বাজেটে উন্নততর ভারত গঠনের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে

With Best Compliments from -

A

Well wisher

যে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে তার সঙ্গে বর্তমান আয়- ব্যয়ের হিসাব ও অতীতের আর্থিক গতিপ্রকৃতি কতটা সঙ্গতিপূর্ণ। আমরা আগেই বলেছি শুধু এই বাজেটেই নয়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বর্তমানে সরকারের মূল লক্ষ্যই হলো উন্নততর ভারতগঠন এবং যার মূলমন্ত্র হলো সবকা সাথ সবকা বিকাশ। অর্থাৎ নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতী নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ, সমস্ত রাজ্য তথা অঞ্চল প্রভৃতিদের এই দ্রুত উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অংশীদার তথা চালক করে ভারতের সামাজিক ও অর্থনীতির একটা সামগ্রিক সুষম উন্নয়ন করা যার দ্বারা ভারত উন্নত দেশে পরিণত হয়।

আমরা জানি যে কোনো দেশের দ্রুত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রধান হাতিয়ার হলো সামাজিক অর্থনৈতিক পরিকাঠামো। মোদীজীর নেতৃত্বে বর্তমান সরকার শুধু এই বাজেটেই নয়, অনেক আগে থেকেই সমস্তরকম পরিকাঠামো উন্নয়নে (যথা— রাস্তাঘাট, যানবাহন, রেলওয়ে, জলপথ, বিমান পরিষেবার পরিকাঠামো, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিকাঠমো, কৃৎকৌশল তৈরির পরিকাঠামো, পরিবেশ রক্ষার পরিকাঠামো প্রভৃতিতে) সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। এই বাজেটও তার ব্যতিক্রম নয়। এই বাজেটেও সমস্ত ক্ষেত্রে ডিজিটাল ও আকৃতিগত আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো তৈরিতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে মূলধনী ব্যয়ের বৃদ্ধিই তার প্রমাণ।

এছাড়াও বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বৃদ্ধি এর অংশীদার। এই বাজেটে রাস্তাঘাট নির্মাণ, পরিবহণ ও হাইওয়ে তৈরিতে বিনিয়োগ করা হয়েছে ২.৭৮ লক্ষ কোটি টাকা। রেলওয়ে উন্নয়নে ২.৫৫ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। যানবাহন উন্নয়নে ধরা হয়েছে ১.৩৭ লক্ষ কোটি টাকা। সুতরাং পরিকাঠামোর উন্নয়নের লক্ষ্য বাস্তবায়নে কোনো অসুবিধা হবে না বলে আশা করা যায়। পাশাপাশি পরিকাঠামো উন্নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেসরকারি বিনিয়োগ ব্যয় (দেশি ও বিদেশি) অনেক বাড়বে ও আর্থিক উন্নতি ত্বরান্বিত হবে।

এই বাজেটে কাঠামোগত ভারসাম্য রক্ষার মাধ্যমে রাজস্ব ঘাটতি, আর্থিক ঘাটতি, সরকারি ঋণের পরিমাণ কমিয়ে, মূলধনী-ব্যয় উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়িয়ে, সবরকম পরিকাঠামো উন্নয়নে ব্যয় বাড়িয়ে সুষম ও সুসংহত দ্রুত আর্থ-সামাজিক সামগ্রিক উন্নয়নের চেষ্টা করা হয়েছে।

অন্যদিকে 'অমৃতকালের' বাস্তবায়নের জন্য স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে যেমন আশাকর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি-কর্মী ও সহায়তাকারীদের স্বাস্থ্য পরিসেবা দেওয়ার জন্য 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। গরিব, মধ্যবিত্ত এবং যারা ভাড়া বাড়িতে থাকে তাদের বাসস্থানের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে; এর জন্য ব্যয় বাড়িয়ে ৮০,৬৭১ কোটি টাকা করা হয়েছে। ট্যুরিজিম উন্নয়নের জন্য (প্রাকৃতিক ও ধর্মীয়) বিভিন্ন প্রকল্প নেওয়া হয়েছে ও এর জন্য পরিকাঠামো তৈরির কথা বলা হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগে ব্যয় বাড়ানো হবে।

এর পাশাপাশি ডেয়ারি প্রকল্প ও মৎস্য-সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে ব্যয় ৬৩৯ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৮৮০ কোটি টাকা করা হয়েছে। MGNREGS ও আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে ব্যয় এই বাজেটে অনেক বাড়িয়ে যথাক্রমে ৮৬ হাজার কোটি টাকা ও ৭৪০০ কোটি করা হয়েছে। উৎপাদনের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত প্রকল্পগুলিতে প্রেরণামূলক ব্যয় ৪৬৫ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৬২০০ কোটি টাকা কর হয়েছে। পরিবেশ সুরক্ষার জন্য Solar Power (Grid) প্রকল্পে ও National Green Hydrogen প্রকল্পে ব্যয় প্রভৃত পরিমাণ বাড়িয়ে যথাক্রমে ৮৫০০ কোটি ও ৬০০ কোটি টাকা করা হয়েছে। যুবশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কার্যকরী উদ্যোগ বৃদ্ধির জন্য প্রধানমন্ত্রী মুদ্রাযোজনাতে ৪৩ কোটি টাকা লোনের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে এবং PM Shri প্রকল্পে ব্যয় বাড়িয়ে ৬০৫০ কোটি টাকা করা হয়েছে। দেশের নারীশক্তি বৃদ্ধির জন্যও বিভিন্ন ব্যবস্থা এই বাজেটে নেওয়া হয়েছে।

করের হার অপরিবর্তিত থাকলেও মানুষের নিট আয় বাড়লে, মানুষের ক্রয় ক্ষমতা তথা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে। এই বাজেটে তারই একটা ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। করের হার পরিবর্তন না করেও দেশের প্রকৃত জাতীয় আয় বাড়লে সরকারে রাজস্ব, দেশের দ্রব্যসামগ্রীর মোট চাহিদা বাড়বে। ফলত, সরকার বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় বাড়াবে ও সামাজিক সুরক্ষা বৃদ্ধি পাবে।

সার্বিক ভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে বলা যেতে পারে যে বর্তমান বাজেটে কাঠামোগত ভারসাম্য রক্ষার মাধ্যমে রাজস্ব ঘাটতি, আর্থিক ঘাটতি, সরকারি ঋণের পরিমাণ কমিয়ে, মূলধনী-ব্যয় উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়িয়ে, সবরকম পরিকাঠামো উন্নয়নে ব্যয় বাড়িয়ে সুষম ও সুসংহত দ্রুত আর্থ-সামাজিক সামগ্রিক উন্নয়নের চেষ্টা করা হয়েছে। এই প্রচেষ্টা প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত সরকার প্রথম থেকে চলিয়ে এসেছে ও বর্তমানেও চালিয়ে যাচ্ছে যাতে ভারতকে দ্রুত উন্নত দেশে পরিণত করা যায়। আশা করা যায়, এই উন্নয়ন প্রক্রিয়াতে দেশের সমস্ত অঞ্চল, অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্রে ও সমস্ত স্তরের মানুষ সরাসরি অংশীদার হবে এবং এর সুফল ভোগ করবে।

(লেখক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক)

সরস্বতী বন্দনা স্কুলে রোজ হওয়া উচিত

কল্যাণ গৌতম

অর্থাৎ মুসলমান কবিরাও সংস্কৃতির এই রীতিকে মেনেই কাব্য রচনা করেছেন। বিদ্যা নিকেতনে সরস্বতী পূজা সেই আবহমানকাল ধরে প্রচলিত সংস্কৃতির এক পরম্পরা, এর সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার যোগ আনাটাই এক সাম্প্রদায়িক কাজ হবে। সরস্বতী নদীর তীরে পাললিক মৃত্তিকায় উর্বর কৃষি ও উন্নত জ্ঞানচর্চার স্বীকৃতি ও সংস্কৃতিতে একটি নদী হয়ে গেল দেবী। এটি একটি ধন্যবাদাত্মক চিন্তন। সুতরাং, সরস্বতী বন্দনা ধর্মীয় যত না, তার চাইতেও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার।

অন্নদামঙ্গল কাব্যে সরস্বতী বন্দনায় বলা হয়েছে,

'তোমার করুণা যারে
সবে ধন্য বলে তারে
গুণিগণে তাহার গণন।'

শিল্পী ও বিদ্যাবিদরা চান তাদের জীবনের দুঃখনিবৃত্তি। শিল্পজীবনে ও বিদ্যার জগতে আপাত প্রতিষ্ঠাই এই দুঃখ নিবারণ করতে সক্ষম, লাভ হতে পারে জীবনে চলার পাথেয়। তাই কাব্য-সাহিত্যের জগতে, লোকসংগীত ও লোকনাট্যের আসর-বন্দায় সরস্বতীর স্তব-স্তুতি করা হয়। প্রাচীনকাল থেকেই এই রীতি মানা হচ্ছে, আধুনিক লোককবিরাও ত

বিশিষ্ট বিদ্যাবিদ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ লিখেছিলেন, 'ঋগ্বেদের কোনো স্থানে এমন উক্তি নাই যাহা দিয়া দেখানো যাইতেছে যে, সরস্বতী নদী দেবতা ব্যতীত আর কিছু।' বরং বেদে পাওয়া যায়, 'অম্বিতমে নদীতমে দেবীতমে সরস্বতী।' সরস্বতী অষ্টাদশ বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী, তন্ত্র ও মন্ত্রে কীর্তিতা এবং নৃত্যগীত ইত্যাদি সকল কলাবিদ্যার দেবীরূপে চিহ্নিতা হলেও আদিতে তিনি ছিলেন জলের দেবী, নদীরূপে পূজিতা।

স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো বক্তৃতার আগে দেবী সরস্বতীকে স্মরণ-মনন করেছিলেন। একটি কবিতায় ('গাই গীত শুনাতে তোমায়') তিনি লিখেছিলেন,

'বাণী তুমি, বীণাপাণি কণ্ঠে মোর
তরঙ্গে তোমার ভেসে যায় নরনারী।'

আমেরিকার নরনারী তো ভেসেই গিয়েছিলেন, যখন স্বামী বিবেকানন্দ সম্ভাষণ করলেন, 'Sisters and brothers of America।'

কাব্য-সাহিত্যের মুখবন্ধতে, শিক্ষা আলোচনা ও শিক্ষাদানের শুরুতে, লোকসংস্কৃতির আসরবন্দনায় সরস্বতী বন্দনা একেবারেই অসাম্প্রদায়িক রূপে বিবেচিত হতো। তার দু-একটি প্রমাণ উল্লেখ রা যেতে পারে।

১. কাজী নজরুল ইসলাম একটি লেটো গানের আসরবন্দনায় সরস্বতীকে 'সর্বমঙ্গলা' নামে অভিহিত করেছিলেন।

'এসো গো মা সরস্বতী সর্বমঙ্গলা।
তোমার আসরে বাজে হারমণি বেহালা।'

২. মহম্মদ কবীরের লেখা 'মধুমালতী' কাব্যের সুচনায় সরস্বতী বন্দনা রয়েছে।

'সরস্বতীর পদে করম নমস্কার।
পৃথিবী হইল নৌকা সংসার অপার।।
শির রাখি প্রণমি এ পদে করতার।
গোপত থাকিয়া কর মহিমা তোমার।'

অনুসরণ করে থাকেন। হঠাৎ কী এমন ঘটল যে সরস্বতীর উপর এত বিক্ষোভ? মঙ্গলকাব্যে সরস্বতীবন্দনা তো আছেই, মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলমান উভয়েই সরস্বতীবন্দনায় ব্রতী হয়েছিল! কেউ আপত্তি করতে আসেননি, বন্দনার জন্য কেউ মারধোর খেয়েছেন এমন কথাও শোনা যায়নি। পুরো বিষয়টিই যে অসাম্প্রদায়িক ছিল, এই সহজ সত্যটা যেন আজকের বিদ্যাবিদরা মনে রাখেন, দেবীকে না মানলেও লোকসংস্কৃতির আঙ্গিককে যেন মান্যতা দেন।

ওঝাদের মন্ত্রে বাদ যান না দেবী সরস্বতী; কখনো দেখা যায় এই ঝাড়ফুঁক-এর মন্ত্র মুসলমানি লোক-চিকিৎসকরাও ব্যবহার করেন। অক্ষয় কুমার কয়াল সংগৃহীত একটি ঝাড়ফুঁক মন্ত্র এই রকম—

'আকর্ণ পুরি এ জুড়ি বাল্মীকির বাণ।
দেবতা অসুর কাঁপে নাহি সহে টান।।
ইন্দ্রের ঘরনি কাঁপে পাতালে বসুমতী।
চৌষট্টি ভৈরবী কাঁপে লক্ষ্মী-সরস্বতী।।'

একটি মুসলমানি ছড়ায় সরস্বতীর কথা আছে। লোকবৃত্তের বাসিন্দারা দেবী সরস্বতীর মধ্যে কোনো ভেদবুদ্ধি রাখতেন না, আজ কেন সরস্বতী নিয়ে এত ভেদবুদ্ধি রচনা করে বুদ্ধিজীবীরা সরস্বতীকে ব্রাত্য করে তুলছেন? ঢাকা থেকে প্রাপ্ত একটি পুরনো মুসলমানি ছড়া এইরকম,

'ধলা মাইয়া সারিন্দা হাতে
সোনার বরণ কলসি কাঁখে
পাশে বইস্যা প্যাঁচা।'

সরস্বতীকে শিক্ষার অঙ্গন থেকে সরিয়ে সুবিধা করে দেওয়া হচ্ছে কাদের? কোনে প্রয়োজন তো নেই! সরস্বতী কখনই সাম্প্রদায়িক বিভাজনের সংস্কৃতি ছিল না। তার অসম্প্রদায়িক রূপ বিদ্যালয়গুলিতে ফিরিয়ে দেওয়া হোক। দেবী আমাদের চৈতন্যের বিদ্যা দিন।

ফিরে এল সোনালি অতীত

নিলয় সামন্ত

১৪ বছরের সর্বভারতীয় ট্রফির খরা কাটিয়ে ২০১৪ সালে বেঙ্গালুরুর কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে আই লিগ জয় করেছিল মোহনবাগান। ২০২৪-এ অর্থাৎ ১০ বছর পরে ইস্টবেঙ্গলও ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে কলিঙ্গ সুপার কাপ জয় করে ১২ বছরের সর্বভারতীয় ট্রফির খরা কাটালো। ইস্টবেঙ্গলের এই জয় পশ্চিমবঙ্গকে আবার সর্বভারতীয় স্তরে সেরা জায়গায় নিয়ে এল। মোহামেডান স্পোর্টিং যেভাবে খেলছে তাতে সামনের বার যদি তারা আই লিগ চ্যাম্পিয়ান হয়ে ইন্ডিয়ান সুপার লিগে খেলর যোগ্যতা অর্জন করে তাহলে মনে হয় আবার ফুটবলে পশ্চিমবঙ্গের রমরমা শুরু হয়ে যাবে।

সুপার কাপ জিতে শুধু ১২ বছরের ট্রফি খরা কাটানোই নয়, আরও বড়ো চমক অপেক্ষা করে রয়েছে ইস্টবেঙ্গলের সামনে। আবার এশীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় খেলতে চলেছে ইস্টবেঙ্গল। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-২-এরক যোগ্যতা অর্জন পর্বে খেলতে চলেছে তারা। সুপার কাপ জয়ী দলকে এই সুযোগ দেওয়া হয়। ইস্টবেঙ্গলের সামনে সেই সুযোগ এসে গিয়েছে।

ফাইনাল খেলার শুরুতেই সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। মাঝমাঠে ফাউল হয়েছিল। হোসে পারদোর ফ্রিকিক থেকে বল পেয়েছিলেন নন্দকুমার। তবে তাঁর শট বাঁচিয়ে দেন বিপক্ষ গোলকিপার মাউইয়া।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই নামিয়ে দেন নাওরেম মহেশকে। সঙ্গে জাতীয় দলে যাওয়া আর এক ফুটবলার লালচুংনুঙ্গা। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তার ফল পায় ইস্টবেঙ্গল। ওড়িশার ডিফেন্ডারদের কাটিয়ে মাঝমাঠ থেকে তাঁর ডিফেন্সচেরা পাস যায় নন্দকুমারের উদ্দেশে। ঘাড়ের কাছে থাকা ওড়িশা ডিফেন্ডার এবং সামনে থাকা গোলকিপারকে কাটিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় বল জালে জড়িয়ে দেন ডার্বিতে গোল করা নন্দকুমার।

কিছুক্ষণ পরেই একটি ন্যায্য পেনাল্টি থেকে বঞ্চিত হয় ইস্টবেঙ্গল। বক্সের মধ্যে নন্দকুমারকে ফেলে দেন ওড়িশার এক ফুটবলার। কিন্তু লাল-হলুদ ফুটবলারদের কাতর আবেদনে কর্ণপাত করেননি রেফারি। তবে পরের মিনিটেই ইস্টবেঙ্গলকে একটি পেনাল্টি দেন, যা নিয়ে হতেই পারে। হিজাজি মাহেবের থেকে বল পেয়ে বক্সে ঢুকে পড়েছিলেন বোরহা। তাঁকে ফেলে দেন মুর্তাদা ফল। তবে রিপ্লে-তে দেখা যায় ফলের সঙ্গে বোরহার কোনও স্পর্শ হয়নি। এবার ওড়িশার ফুটবলারদের আবেদন কানে তোলেননি রেফারি। পেনাল্টি থেকে ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দেন সাউল ক্রেসপো। রেফারির সঙ্গে তর্ক করে হলুদ কার্ড দেখেন ফল।

সাত মিনিট পরে দশ জন হয়ে যায় ওড়িশা। এবার একটি হেড করতে গিয়ে বোরহার ঘাড়ে কনুই দিয়ে আঘাত করেন ফল। রেফারি তাঁকে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড তথা লাল কার্ড দেখান। ৮০ মিনিটের মাথায় অল্পের জন্য বেঁচে যায় ইস্টবেঙ্গল। একটি বল ক্লিয়ার করতে দেরি করেন হিজাজি। অমেয় রানাওয়াড়ের শট বারে লাগে। নন্দকুমারের জয়গ পিভি বিষ্ণুকে নামান কুয়াদ্রাত। কিন্তু বিষ্ণু এমন দুটি সুযোগ মিস করেন যে ১০ মিনিটের মধ্যে তাঁকে তুলে নিতে হয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তাঁকে গোল করার বল সাজিয়ে দিয়েছিলেন বোরহা। কিন্তু আশেপাশে সতীর্থদের খুঁজতে গিয়ে দেরি করে ফেলেন বিষ্ণু। তাঁর মারা শট বাঁচিয়ে দেন মাউইয়া।

অতিরিক্ত সময়ের প্রথমার্ধে পাঁচ মিনিটের মাথায় এগিয়ে যেতে পারত ইস্টবেঙ্গল। শৌভিকের শট বাড়ে লাগে। তার পরেই মেজাজ হারিয়ে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখেন তিনি। ওড়িশার মতো ইস্টবেঙ্গলও দশ জন হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ার্ধে গোলের সুযোগ করে দেয় ওড়িশাই। বলা ভালো, ওড়িশার গোলকিপার মাউইয়া। গোটা ম্যাচে একাধিক বার দলের পতন রুখলেও আসল সময়ে ভুল করে বসেন। ইস্টবেঙ্গলের একটি আক্রমণের পর বল পাস করতে গিয়েছিলেন নরেন্দ্র গেহলৌতকে। কিন্তু নরেন্দ্রের কাছেই ছিলেন ক্লেটন। তিনি ওড়িশার ডিফেন্ডারের থেকে বল ছিনিয়ে নেন। ততক্ষণে গোলমুখ থেকে অনেকটাই দূরে ছিলেন মাউইয়া। তার মধ্যেই নিখুঁত প্লেসিঙে বল জালে জড়িয়ে দেন ক্লেটন।

জার্সি খুলে সাইডলাইনে গিয়ে শুয়ে পড়েন ইস্টবেঙ্গলের স্ট্রাইকার। তাঁর উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়েন বাকি ফুটবলার এবং সাপোর্ট স্টাফেরা। তবে কোচ কুয়াদ্রাত তখনও জানতেন খেলা বাকি। তাই সবাইকে শান্ত হতে বলেন। একই জিনিস অবশ্য দ্বিতীয়বার হয়নি। অতিরিক্ত সময়ে এবার আর সমতা ফেরাতে পারেনি ওড়িশা। রেফারি সম্মুগম শেষ বাঁশি বাজাতেই গ্যালারিতে লাল-হলুদ জনতার উচ্ছ্বাস শুরু হয়ে যায়। □

সোনার হরিণ

বহুকাল আগে বোধিসত্ত্ব একবার হরিণ হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। অন্যান্য হরিণের তুলনায় বোধিসত্ত্বরূপী হরিণ ছিল অনেক বেশি সুন্দর। তাই সবাই তাকে সোনার হরিণ বলে ডাকত । সোনার হরিণের স্ত্রীও ছিল খুব সুন্দরী। সোনার হরিণ ছিল জঙ্গলের হরিণদের দলপতি। তার নেতৃত্বে হাজার হাজার হরিণ সারাদিন মনের আনন্দে একসঙ্গে ঘুরে বেড়াত।

একবার এক শিকারি গভীর জঙ্গলে ফাঁদ পেতে আড়ালে লুকিয়ে রইল। দলপতি সোনার হরিণ সবার আগে চলছিল, তাই ফাঁদে সে-ই প্রথমেই আটকা পড়ল। অনেক চেষ্টা করেও সে নিজেকে ছাড়াতে পারল না। ধীরে ধীরে আরও বেশি করে জালে জড়িয়ে পড়ল।

এদিকে অন্যান্য হরিণ জানতেও পারল না যে তাদের দলপতি ফাঁদে আটকা পড়েছে। ফাঁদে আটকে পড়ে সোনার হরিণ চিৎকার করতে লাগল। তার স্ত্রী বহুদূর থেকে স্বামীর চিৎকার শুনে ছুটে চলে এল। হরিণী বলল, প্রভু আপনি তো মহা শক্তিশালী। আপনাকে আটকে রাখার ক্ষমতা তো কারও নেই।

সোনার হরিণ বলল, আমি বহু চেষ্টা করেছি ফাঁদ থেকে মুক্ত হবার জন্য কিন্তু কোনো ফল হয়নি। হরিণী সান্ত্বনা দিয়ে বলল, ঠিক আছে প্রভু আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। শিকারি এলে আমি তার কাছে আপনার প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে নেব।

এদিকে শিকারি হরিণ ফাঁদে পড়েছে দেখে ধারালো ছুরি নিয়ে এগিয়ে এল। কাছে এসে আশ্চর্য দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। একটি হরিণ ফাঁদে পড়েছে আর একটি হরিণ ফাঁদের বাইরে দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেলছে।

শিকারি এগিয়ে এলে হরিণী বলল, আপনি আমার স্বামীকে নিয়ে যাবেন না। ওকে নিয়ে গেলে আমাদের দলের খুব ক্ষতি হয়ে যাবে। তার চাইতে আপনি আমাকে নিয়ে যান। উনি আমার স্বামী। আর উনি জঙ্গলের হরিণদের দলপতি।

দয়া করে আপনি ওঁকে মুক্ত করে দিন।

শিকারির মন গলে গেল। সে সোনার হরিণকে মুক্ত করে দিল। মুক্ত হতেই সোনার হরিণ একছুটে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। খকিক্ষণ বাদেই মুখে একটি মণি নিয়ে ফিরে এল। মণিটি শিকারির হাতে দিয়ে বলল, দয়া করে আর আপনি কোনো পশু শিকার করবেন না, এই মণি বিক্রি করে আপনি যা টাকা পাবেন তাতে আপনার সারা জীবন কেটে যাবে।

শিকারি এই কথায় রাজি হয়ে গেলে হরিণ আর হরিণী ধীরে ধীরে বনের পথে পা বাড়াল।

সংগৃহীত

বীর বনবাসী

লীপা

লীপা ছিলেন গ্রেট আন্দামনি সম্প্রায়ের স্বাধীনতা সংগ্রামী। জন্ম আন্দামানেই। আন্দামানে জনজাতিদের অধিকার হরণের প্রতিবাদে লীপা মানুষকে সংগঠিত করেন। তাঁর নেতৃত্বে হাজার হাজার আন্দামানি জনজাতি ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে শামিল হয়। লীপার স্বামী দুধনাথ ইংরেজদের চর হিসেবে করতে শুরু করলে স্বামীর চিহ্ন বিলুপ্ত করতে নিজের গর্ভস্থ সন্তানকেও তিনি নষ্ট করেন। তাঁর আত্মত্যাগ ইতিহাসে বিরল। তাঁকে রাজপুতনার ধাত্রী পান্নার সঙ্গে তুলনা করা হয়।

এসো সংস্কৃত শিখি– ১০

আম, ন, বা ?— (হ্যাঁ, না, কি?)
শিক্ষক— **চষকঃ বা ?**— গেলাস কি?
ছাত্র— **আম্, চষকঃ।**— হ্যাঁ, গেলাস।
(একটি কলম দেখিয়ে)
শিঃ— **লেখনী বা ?** কলম কি?
ছাঃ— **আম্, লেখনী।**
শিঃ— **উপনেত্রম্ বা ?**
ছাঃ— **আম্, উপনেত্রম্।**
ন—না
চষকঃ বা ?— গেলাস কি?
ন, চষকঃ ন, কূপী।— না, গেলাস নয়, বোতল।
অভ্যাস করি—
চমষঃ, ঘটী, দ্বারম্, শাটিকা, দ্বিচক্রিকা, হস্তঃ, দ্রোণী, কপাটিকা, করবস্ত্রম্, সূতঃ।

ভালো কথা

প্রাণপ্রতিষ্ঠা

গত ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় শ্রীরামমন্দিরে রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হলো। তার আগে থেকেই আমাদের পাড়ায় বাড়ি বাড়ি নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। ২২ তারিখে সারাদিন আমাদের পাড়ায় দুর্গাপূজার মতো আনন্দের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। আমাদের পাড়ায় শিবমন্দিরে রামের ছবি লাগিয়ে পূজা হয়েছে। বড়ো পর্দা লাগিয়ে রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান সরাসরি দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পর্দায় রামলালার মুখ দেখা যেতেই সবাই জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিতে লাগল। বড়োদের সবার চোখে জল দেখছিলাম। কেন জানি না আমারও চোখে জল এসেছিল। মনে হয় আনন্দে। সেদিন সন্ধ্যায় আমরা টুনিবাল্ব দিয়ে আলোয় বাড়ি সাজিয়েছিলাম।

অঙ্কিতা মুখোপাধ্যায়, একাদশ শ্রেণী, ফারাক্কা ব্যারেজ কলোনি, মুর্শিদাবাদ।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

রামমন্দির

স্নেহাশিস দাস, একাদশ শ্রেণী, ব্যান্ডেল, হুগলী।

অযোধ্যাতে শ্রীরামমন্দিরের
পুনঃপ্রতিষ্ঠা হলো
বহুদিনের অপমানের
কলঙ্ক দূর হলো।
রামমন্দির শুধু মন্দির নয়কো
জাগ্রত স্বাভিমান
সুশাসনের পথে ভারত
উন্নত জীবন মান।

সীমান্তেও কড়া ভারত
ভেতরেও শক্ত
জঙ্গিরা আর পারছে নাকো
ঝরাতে মায়ের রক্ত।
দেশের আজ মহাভাগ্য
প্রধানমন্ত্রী সুসন্তান
তাইতো ভারত বিশ্বে এখন
হয়েছে আগুয়ান।

লেখা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা ই-মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪

৯০৫১৭২১৪২০

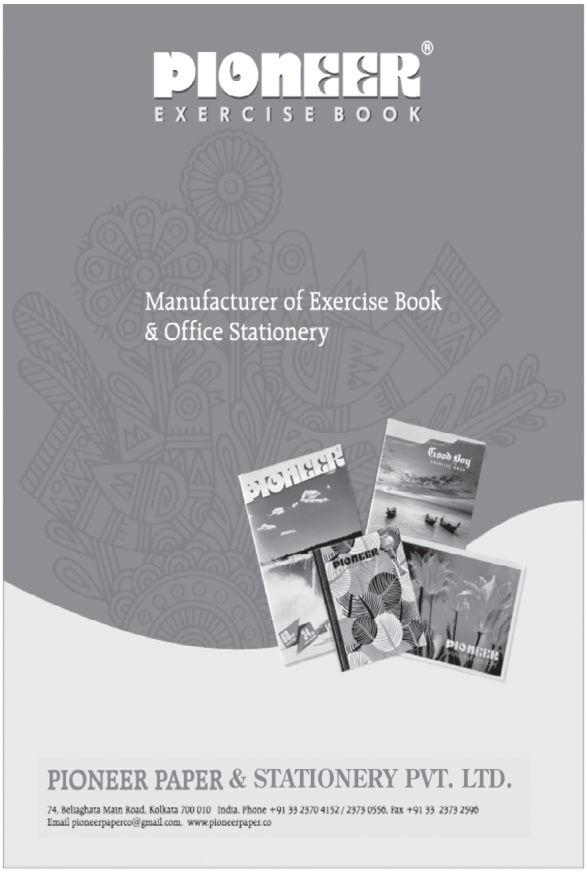

With Best Compliments from -

A

Well wisher

সাগরতলেই রয়েছে সম্পদের ভাণ্ডার

শেখর সেনগুপ্ত

জলের আর এক নাম জীবন। সেই জলের সাত সাতটি মহাভাণ্ডার আবার বিভিন্ন নামের, বিভিন্ন মাপের, বিভিন্ন চরিত্রের মহাসমুদ্র। পৃথিবীর চারভাগের তিনভাগই যে জল, তার মুখ্য অবদান তো ওই সাত জলাধারেরই। স্বভাবেও তারা আলাদা। অনেকে সাগরে নামলেই সানন্দে নেচে ওঠেন। অনেকের মন আবার ভীষণ ভয়ভরে বিষিয়েও যায়। কেউ আবার বুঝি অন্ধকারে দেন ডুব, কেউ আবার একাকী বা সারবন্দি দাঁড়িয়ে হাঁকডাক ছেড়ে সানন্দে হয়ে ওঠেন মুখর। কালের আরোহী প্রত্যেক সচেতন মানুষ সাগরের রূপ ও শক্তিকে মান্যতা দিতে বাধ্য। তাঁরা জানেন, সমুদ্রকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হলে আগামী দিনে মুখ্য বিপদগুলির মোকাবেলা করতে তাঁরা পারবেন না। এহেন প্রতিটি সাগরের নিজস্ব ভাণ্ডারে সঞ্চিত রয়েছে ত্রিভুবনের তাবৎ সম্পদের সিংহভাগ।

লঙ্কেশ্বর রাবণের খুব সাধ হয়েছিল সেই অপরিমিত সম্পদের তিনিই হবেন একমেবাদ্বিতীয়ম্ অধিকারী। কিন্তু সেই বাসনা পূর্ণ করতে গিয়ে রাবণ তীব্র প্রতিরোধের মুখোমুখি হলেন অতলান্তনিবাসী অন্য এক দানবের, যাঁর নাম নিবাতকবচ। মাদল-ধামাসা ইত্যাদি রণবাদ্য বাজিয়ে সাতসাগর দাপিয়ে দুই অনার্য প্রভু এমন লড়াই লড়লেন যে সাগরনিবাসী বহু জীব জল ছেড়ে সেই যে স্থলে উঠে এলো, তারা আর তাদের অতল বাসভূমিতে ফিরে গেল না। রাবণও জানকবুল লড়াই চালিয়ে নিবাতকবচের নিপাত ঘটাতে পারেননি। তবে তিনি সমুদ্রের আর এক মস্তান বরুণকে যুদ্ধে হারিয়ে অজস্র সম্পদকে নিয়ে চলে আসেন তাঁর লঙ্কাকে রূপে-মাধুর্যে-গৌরবে একেবারে অনন্য করে তুলতে। রাবণের জীবনে যতটা সাফল্য, ততটাই ব্যর্থতা। যতটুকু সুনাম, তার চেয়ে বেশি দুর্নাম। হাজার চেষ্টা করেও সামুদ্রিক বিত্তের সার্বিক পরিচয় তিনি পাননি। আর পাননি বলেই সাগরবিষয়ক নীতিবাক্যামৃতও তাঁর বচন থেকে আমরা পাইনি।

সেই অজ্ঞতার একটি মধ্যম অংশ আজও আমাদের কাছে অটুট, যে কারণে সমুদ্রকে নিয়ে মানুষের বুদ্ধির খেলা এখনও তেমন শাণিত হয়ে ওঠেনি। যদিও আকাশপথে ভিন্ন গ্রহে পা রাখাটা এখন আর পুরোপুরি স্বপ্ননির্ভর নয় বুদ্ধি ও বাস্তববোধে সমৃদ্ধ মানুষের কাছে। পুঁথি-কিতাবের পাহাড় মাথায় নেওয়া জ্ঞানসাগরের বড়ো সাঁতারু অ্যারিস্টটলের ষোলোআনা বাসনা ছিল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তিনি সমুদ্রকে চিনবেন এবং মানব জাতিকেও চেনাবেন। বাস্তবে অ্যারিস্টটলের পক্ষে তা আর সম্ভব হয়নি। তাঁর প্রিয় ছাত্র ম্যাসিডনের অধিপতি আলেকজান্ডারকে তিনি বলেছিলেন, 'তুমি তো এক ব্যতিক্রমী ইনসান। তোমার রক্তে রয়েছে বিশ্বজয়ের নেশা ও সামর্থ্য। এদের প্রভাবে তুমি অবশ্যই বিশ্বের বহু দেশকে পদানত করবে। কিন্তু দু'টি শর্ত তুমি স্মরণে রেখো অবশ্যই। প্রথমত, কদাচ তোমার সবিক্রম পাখসাটে

ফঃ ৬

যেন কোনও গ্রন্থাগার পুড়ে ছাই না হয়ে যায়। বই যেমনই হোক, তাকে মাথায় করে রাখবে। কারণ, বইকে যে শ্রদ্ধা ও মান্যতা দেয় না, তাঁর অন্যবিধ ঝলঝলানিতেও গুরুত্ব দিও না।

দ্বিতীয়ত শর্ত হলো, বিশ্বের প্রতিটি সাগরের প্রতি তোমার যেন থাকে শ্রদ্ধা এবং অকুণ্ঠ নির্ভরতা। সমুদ্র যখন উত্তাল হয়ে উঠবে, তুমি তার কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখবে। কারণ, সাগরের শক্তি ও দাপট দুই-ই প্রায় সীমাহীন; যে কোনও বলদর্পী মানুষকে সে নস্যাৎ করে দিতে পারে। এক সময়ে আমারও বাসনা ছিল, আমি একবার সমুদ্রের গভীরতাকে মাপবো। কিন্তু আমার নিজের সকল মেধা ও শ্রমকে প্রয়োগ করেও সেই বিদ্যা অর্জন করতে পারিনি। সমুদ্রের বহু কিসিমের বৈশিষ্ট্য ও সম্পদ সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের প্রয়াস অদ্যপি অব্যাহত। বিজ্ঞানের সহায়তায় সাগরকে পূর্ণভাবে জানতে মানুষ তার চেষ্টা শুরু করেছিল সোয়া দুশো বছরেরও আগে। তখন থেকেই সাগর-উপসাগর পেরিয়ে সাম্রাজ্য বিস্তারের তাগিদে ইউরোপের শক্তিশালী দেশগুলির রোঁয়া খাড়া হয়ে ওঠে। দৌড়টা প্রথমে শুরু করেও ক্রমশ পিছিয়ে পড়ে স্প্যানিশ ডাচ, পর্তুগিজরা। কেবলমাত্র লোভ ও বেহিসেবী দৌরাত্ম্যকে পুঁজি করে সূচনাতে অনেকটা পথ পার হলেও তাদের অধিকার স্থায়ী হয়নি, উত্তরপুরুষকেও সালব্যাপি মোটিভেট করতে অপারগ হয়েছে।

লড়াই ও চতুরতার প্রতিযোগিতায় সেরা শক্তিমান হয়ে ওঠে দ্রুত দুটি দেশ--- ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স। ফ্রান্সের তুলনায় ইংল্যান্ড অনেক বেশি সমুদ্রঘেঁষা হওয়ায় তার সাম্রাজ্যবাদ ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদকে অনেক বেশি পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পেরেছে। মানুষ আজ জেনেছে, সমুদ্রের তলায় রয়েছে অসংখ্য পাহাড়, পর্বত, টিলা। সেখানেই অবস্থান বিশ্বের দীর্ঘতম পর্বতমালা, নাম মিড অ্যাটলান্টিক রিজ (Mid-Atlantic Ridge)। আটলান্টিকের চিত্ত সর্বক্ষণ উত্তাল। প্রবল তার ধাক্কাধাক্কি। ওই দুরন্ত আছাড়িপিছাড়ির মধ্যেও মিড আটলান্টিক রিজ আপন অবস্থান তথা অস্তিত্ব অটুট রেখেছে যুগের পর যুগ। ভাবলে চমকে উঠতে হয়,--- সেই পর্বতমালার দৈর্ঘ্য ও উচ্চতা হিমালয়কেও বহুলাংশে টেক্কা দিচ্ছে। সেই সমুদ্রের তলদেশে যত আপনি বিচরণ করবেন, ততই আপনার নিকট উন্মোচিত হবে— নব নব দুর্গা, খোদা, গড সকলেরই নিবাস। সেখানে আছে বহু সংখ্যক আগ্নেয়গিরি— কে যে কখন উঠবে জেগে, মানুষের বোধবুদ্ধির বাইরে। শিলা, প্রস্তর, খনিজ সম্পদ ইত্যাদির স্তর ভেদ করে মানুষ যান্ত্রিক দাঁত বসাবার চেষ্টা করে চলেছে বহুকাল ধরে। গভীর থেকে গভীরতর।

সূর্যের চাদর সেখানে আদৌ বিছিয়ে নেই। অন্ধকার ঘোর না হলেও দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করবেই। পদে পদে অজ্ঞানতার শিহরণ। কত জাতের যে শিলা! গড়ন হরেক প্রকারের। কোনোটি পাঁশুটে থমথমে, কোনোটি আবার যেন মানুষের কেশবিরল মস্তিষ্ক। সবচেয়ে ওজনদার আগ্নেয়শিলা ব্যাসল্ট, তারপর গ্রানাইট— আরও কত তাদের পরিচিতি। এদের ফাঁকফোকর দিয়ে দিয়ে প্রায়শ' বেরিয়ে আসে তরল তপ্ত লাভা। লাভার বিবিধ কিসিমের সৃষ্টিমুখী ক্রিয়াকর্ম সর্বাধিক লক্ষণীয় প্রশান্ত মহাসাগরে। এই মহাসাগরটির বুকেই ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠেছে গণ্ডাদেড়েক ব্যাসাল্ট আইল্যান্ড। প্রথমাবধি সাগরপাড়ি দিতে মানুষ আগ্রহী। সমুদ্র যেন তাকে হাতছানি দেয়। সমুদ্রের বিশালত্ব, গভীরতা, অস্থিরতা তাকে প্ররোচিত করেছে বারবার জলধির বুকে নেমে পড়তে। সাগরই তো যথার্থ অপক্ষপাত মহাশক্তি, প্রকৃতিকে প্রভাবিত করে তার গভীর মনীষা। সাগরের ওপর সম্যক নির্ভরতা ছাড়া মানুষ তার অধিকার ও অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে পারবে না। সমুদ্রই মানুষকে প্ররোচিত করেছে বারবার নোনাজলে নেমে পড়তে। ভয় নয়, ঘেন্না নয়, আবার খোশামোদও নয়; সাগরকে ভালোবাসতে পেরেছিল বলেই মনুষ্যসভ্যতার বিস্তৃতি ঘটে। নামডাক ছাড়াই এখনও কত মানুষ চমৎকারভাবে কখনো স্থলে, কখনো জলে বিচরণ করেন। তবে সামুদ্রিক রহস্যের সম্পূর্ণটা আজও স্পষ্ট হয়নি মানুষের কাছে। বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে এই প্রয়াস চলেছে দু'শো বছরেরও বেশি সময় ধরে।

সমুদ্রপথকে কাজে লাগিয়ে সাম্রাজ্য বিস্তারের দৌড় যে সকল ইউরোপীয় দেশ একদা শুরু করেছিল, তারা এখন তাদের সেই দাপট হারিয়েছে। লোভ ও কাতরতা থাকলেও, ইংল্যান্ড, স্পেন, ফ্রান্স, পর্তুগালের আর এখন সাধ্য নেই সাগর পেরিয়ে দুনিয়ার অন্যান্য বহু দেশে নিজেদের দাপট দেখিয়ে আসবার। এক সময় কনস্টানস্টাইন জন ফিলিপ নামক এক ইংরেজ বিজ্ঞানী অন্য সব কিছু ছেড়ে দিয়ে ভেসে পড়লেন সমুদ্র চর্চায়। তিনি বললেন, 'পৃথিবীর চারভাগের তিনভাগই যখন জলের তলায়, তখন সাগরের গূঢ় রহস্যগুলিকে ভেদ করতে না পারলে আমাদের অজ্ঞানতার পরিধি আজও পর্বতপ্রমাণই হয়ে থাকবে।' ১৭৭৩ সালে তিনি প্রায় নির্ভুল ভাবেই প্রশান্ত মহাসাগর, ভারত মহাসাগর এবং আটলান্টিক মহাসাগরের গভীরতা নির্ণয় করতে পারলেন। তাঁর জীবনের অভিপ্রায়ই ছিল সামুদ্রিক তলদেশের যে সকল অজানা সম্পদ রয়েছে, সকল প্রতিবন্ধকতাকে দূর করে তিনি তাদের হদিশ দিয়ে যাবেন বিশ্ববাসীকে। হয়তো জীবনদায়ী অনেক ওষুধও মানুষ পেয়ে যাবে সাগরের হৃদয় থেকেই। সারি সারি চেনামুখ পরস্পরের কুশল কামনা করবে সমুদ্রতলে নেমে গিয়েই। পরবর্তী তিন দশকে স্থলের মানুষ জলে নেমে সমুদ্রকে চিনলেন একেবারে আতিপাতি করে। এমনকী কোনো কোনো সামুদ্রিক জীবের পরমায়ু ও প্রজননশক্তি কতটা, তাও তাঁরা নির্ণয়ে সমর্থ হলেন। জলের গভীরতম অঞ্চলে নেমেও মানুষ আর ধ্বস্ত হলো না।

নিরেট অনিশ্চয়তার মধ্যেও বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে সমুদ্রচর্চাকে অব্যাহত রাখলেন যেন বহির্জগতকে নিত্য নতুন চমক দিতে। সেই প্রয়াসগুলির একটিকেও অবমূল্যায়িত করা অনুচিত। অ্যারিস্টটল গত হবার প্রায় সোয়া তিন দশক বাদে সমুদ্র নিয়ে আর এক মস্ত চমক দিলেন ফরাসি বিজ্ঞানী ফ্রাঁসোয়া পেঁরোই। পেঁরোই বিশ্ববাসীকে জানালেন, সমুদ্রের তলদেশে রয়েছে বিভিন্ন সাইজের অনেক রকম ফাঁদ। আপাতভাবে ওদের বিপজ্জনক ও অনিশ্চিত মনে হলেও বহু গর্তে ঠাসা রয়েছে মহামূল্যবান রকমারি খনিজপদার্থ। নদীর বহমানতায় কোথাও কোথাও হদিশ মিলছে বিপুলভাবে সঞ্চিত ওই সকল খনিজ পদর্থের।

বুদ্ধি ও মেধার সাহয্যে পায়ের বেড়ি যত খোলা যাবে, ততই মানুষ সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে সেই সকল সাগরস্নাত সম্পদে। আবার কিছু রয়েছে চরিত্রে একেবারে মরণ ফাঁদ। একবার ঢুকে পড়লে আর বেরিয়ে আসা প্রায় অসম্ভব। ফ্রাসোয়া পেঁরোই একাধিকবার সাগরের শেষস্তরে নেমে ফিরে এসে জানালেন, 'সাগরের যত গভীরে নামবেন, ততই টের পাবেন, ঠাণ্ডা কাকে বলে! শরীরের রক্ত যেন সত্যিই জমাট বাঁধতে চলেছে।'

সাগরের সেই অতলান্তে যে সকল জীব বিচরণ করে, তাদের দেহের গঠনেও রয়েছে বিচিত্র রূপের সব সমাহার। সমুদ্রের অন্তিম তলদেশ কিন্তু আবার এত শীতল নয় যে সবটাই বরফে আচ্ছাদিত হয়ে থাকবে, যদিও পৃথিবীর কোনও কোনও অংশে সাগরে ভাসমান বরফখণ্ড আমরা দেখতে পাই।

বাস্তব সত্য কিন্তু এই যে, সামুদ্রিক সম্পদকে উদ্ধার করতে মানুষ একেবারে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মেতে উঠেছে। যতটুকু হয়েছে বা হচ্ছে, প্রত্যাশার তুলনায় তা কথঞ্চিৎ। তবে সাগর থেকে সম্পদ আহরণের জন্য তথা পারস্পরিক বিবাদ এড়াতে রাষ্ট্রসঙ্ঘ একটি মানচিত্র অঙ্কন

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে জানা গেছে ভারত উপমহাদেশের মহীসোপান এবং মহীঢালে থরে থরে সাজানো রয়েছে বিস্তর পর্বতপ্রমাণ কয়লার ভাণ্ডার। এই প্রাকৃতিক সম্পদকে উদ্ধারের প্রয়াসে আমাদের আরও সক্রিয় হতে হবে।

করেছে। সেই মানচিত্র মোতাবেক প্রতিটি দেশের সামুদ্রিক অধিকার কতটুকু এবং কী তাদের করণীয়, তা নির্ণিত হয়েছে। সাগর-ঘেঁষা প্রতিটি দেশের রয়েছে নির্দিষ্ট 'সামুদ্রিক সোপান' বা 'মহীসোপান'। মহীসোপান নামতে নামতে অতলান্তে গিয়ে থিতু হয়। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় এর পরিচিতি continental slope নামে। বাংলায় আমরা বলে থাকি 'মহীঢাল।' ওই সমুদ্রতলের ওপর নিজ নিজ অধিকারকে নিরঙ্কুশ রাখবার বিষয়ে বিশ্বের প্রতিটি উপকূলবর্তী দেশ কদাপি হতোদ্যম কিংবা নির্লিপ্ত অবস্থায় থাকে না। ভ্রমবশতও যদি কোনো ভিন দেশের জলযান বিনা অনুমতিতে চিহ্নিত জলসীমানা অতিক্রম করে বসে, সংশ্লিষ্ট স্পর্শকাতর ভিন দেশটি নিদেনপক্ষে একবার প্রতিবাদ অথবা হুঁশিয়ারি ছাড়বেই দুনিয়ার সকল দেশকে জানিয়েই। কিন্তু একটা নির্দিষ্ট দূরত্বের পর সমুদ্রের তলদেশে যতই মহার্ঘ সম্পদ আগোচরে থাকুক না কেন, দুনিয়ার সর্বাধিক শক্তিশালী দেশেও তার ওপর নিজের অধিকারকে একচেটিয়া বলে দাবি জানাতে পারে না।

কোনো লিখিত নির্দেশনামা না থাকলেও এটা সকল দেশেই জানে ও মানে যে, মধ্য সমুদ্রের ওপর ও অভ্যন্তরে যা কিছু লভ্য, দুনিয়ার সকল দেশেরই তাতে সমান অধিকার। International law of sea রচনা করে জাতিসঙ্ঘ তা তাবৎ দুনিয়াকে জানিয়ে দিয়েছে এবং ভারত সমেত পৃথিবীর সকল দেশেই তাতে স্বাক্ষর দিয়েছে। স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করেছিল পৃথিবীর মাত্র একটি দেশ। সেই দেশটি ছিল সোভিয়েত রাশিয়া। তার অভিমত ছিল যে, পৃথিবীতে যে সকল দেশের সাগরবিষয়ক ন্যূনতম প্রযুক্তিই নেই, তারা কোন যুক্তিতে সামুদ্রিক সম্পদের সামান্যতম ভাগীদারও হতে পারে? উন্নত ও অনুন্নত, সচল ও নিশ্চল— এই দুই ধরনের দেশের কখনো অভিন্ন অধিকার থাকতে পারে না প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর। আগে যোগ্যতা অর্জন করুক।

মজার বিষয় হলো, বহু ব্যাপারে রাশিয়া ও আমেরিকা দুই ভিন্ন মেরুর হলেও রাশিয়ার প্রস্তাবকে আমেরিকা সেইদিন টেবিল চাপড়ে সমর্থন জানিয়েছিল। সমর্থনে স্বর তুলেছিল জাপানও, যেহেতু সামুদ্রিক সম্পদকে তুলে আনবার জাপ-কুশলতা পশ্চিমি দক্ষতার চেয়ে আর তখন পিছিয়ে ছিল না। আজও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও জাপান সামুদ্রিক সহায়তার সর্বসুখ লাভের হকদার হতে চায়, যদিও দুটো মহাযুদ্ধ জাপানকে যে অবস্থায় এনে ফেলেছে, তার থেকে পুরোপুরি মুক্তি সে আজও অর্জন করতে পারেনি। আবার ভারতের মতো দেশ বহুলাংশে সমুদ্রবেষ্টিত হয়েও সামুদ্রিক কর্তৃত্ব কতদূর পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারবে, তা নিয়ে কিছুটা সন্দেহ থাকছেই। সমুদ্র থেকে খনিজ তেল তুলতে পারছে ভারত। আমাদের উত্তরপুরুষরা আরও অনেক সম্পদ নিশ্চয় সংগ্রহ করতে শুরু করবে একাধিক সাগরের হৃদয়ে অবস্থান করবার সুবাদে। ভারতে সাগর-উপকূলের দৈর্ঘ্য রীতিমত চমকপ্রদ— ৩ হাজার ৭৬০ কিলোমিটার।

এই বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমুদ্রতলের ১১ লক্ষ বর্গ কিলোমিটারের নিরঙ্কুশ অধিকার রয়েছে আমাদের মাতৃভূমির। বিজ্ঞানীরাই জানাচ্ছেন, ভারতের সমুদ্রগুলির তলদেশে রয়েছে হরেক কিসিমের রাশি রাশি খনিজ ভাণ্ডার। ওই বিপুল সম্পদের উদ্ধারে ভারত সরকার কবে যে শপথ নিয়ে কাজে নামবে আমরা জানি না। সেই বিপুল ভাণ্ডার যাতে ক্রমে লুণ্ঠিত না হয়, তা নিয়ে সরকারের আরও সতর্কতার দরকার। এ কাজে ইন্ডিয়ান নেভালফোর্সের দায় সর্বাধিক। চুরির চেষ্টা হলে সংশ্লিষ্ট দেশের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসঙ্ঘে নালিশ করবার হক ভারত সরকারের থাকছেই। সেই সঙ্গে ভারত যখন তার ইত্যাকার প্রযুক্তিকে সমুন্নত করে সামুদ্রিক সম্পদকে আপন অধিকারে আনতে পারবে, সেটা হয়ে উঠবে এই দেশের অর্থনৈতিক উচ্চলম্ফনের একটা অনন্য নিদর্শন। তখন ধনী দেশ রূপে শিরোপা প্রাপ্তি অনিবার্য হয়ে উঠবে আমাদের দেশের।

কাজটা যতই কঠিন হোক না কেন, আমাদের এই পথ ধরে অগ্রসর হতেই হবে। উদাহরণ রয়েছে হাতের কাছেই। পেট্রল-ক্রাইসিসে মুহ্যমান ভারতকে কিছুটা হলেও অক্সিজেন দিয়ে যাচ্ছে বম্বে হাই। সেই নজির ও সূত্রকে অবলম্বন করে সন্ধানীরা পৌঁছে গেলেন বঙ্গোপসাগরের সেই অঞ্চলে, যেখানে গোদাবরী ও কাবেরী এই দুই নদী গিয়ে মিশেছে সমুদ্রে। এখান থেকেই অদূর ভবিষ্যতে আমাদের উত্তরপুরুষরা নিয়মিতভাবে পেতে থাকবে খনিজতেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস। অনুরূপ প্রাপ্তির ষোলোআনা অবকাশ রয়েছে আন্দামান-নিকোবর দ্বীপমালার চতুর্দিকে। ওই সকল উৎস থেকে ভারত যখন শুরু করবে খনিজ তেলের নিয়মিত উত্তোলন, তখন এদেশের সরকারের মনোরঞ্জনের জন্য মরিয়া হয়ে উঠতে বিশ্বের তাবৎ শক্তিশালী ও ধনবান দেশগুলি। সামগ্রিকভাবে ভারতীয়দের কর্মজগৎ এবং গার্হস্থজীবনে প্রবহমান হবে গঠনমূলক বহুবিধ কর্মধারা। সামাজিক পরিষেবার মানও পৌঁছে যাবে এক বিশেষ উচ্চতায়, — যে উচ্চতার চিত্ররূপ আমরা প্রায়শই দেখতে পাই আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রীর বাক্যস্রোতে। হতাশা ও নিরুৎসাহকে বিতাড়ন করা যাবে অবগুণ্ঠন মোচন করে। ভারতের মাথায় শোভা পাবে বিশ্বের অন্যতম তৈলসমৃদ্ধ দেশরূপে স্বীকৃতির মুকুট। অনেক দেশকেই ভারত তখন শর্তসাপেক্ষে পাঠাবে বিবিধ সহায়তা।

ইতিমধ্যেই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান জানিয়ে দিয়েছে যে, ভারত উপমহাদেশের মহীসোপান এবং মহীঢালে থরে থরে সাজানো রয়েছে বিস্তর পর্বতপ্রমাণ কয়লার ভাণ্ডার। তবে ইত্যাকার প্রাকৃতিক সম্পদকে উদ্ধারের প্রয়াসে আমাদের দেশ এখনও তেমন সক্রিয়তা দেখাননি। নেতা-নেত্রীরা নিষ্পাপ দেশপ্রেমে বহুক্ষেত্রেই তেমন নিমজ্জিত নন। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বার্থসিদ্ধির জন্যই তাঁদের যা কিছু শৈলী প্রদর্শিত হয়। দেশের তরে আত্মত্যাগের সাম্প্রতিক নিদর্শন হাতড়ে হাতড়েও খুঁজে না পাবার দরুন এই তথাকথিত নেতা-নেত্রীদের প্রতি অনেকেই বীতশ্রদ্ধ। মানুষ চায় তাঁরাই ক্ষমতাসীন হোন যাঁরা দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য নিজেদেরও দায়বদ্ধ করে থাকেন অকপটে। শিক্ষা ও আর্থিক সাম্য যদি প্রকৃত গুরুত্ব না পায়, পরিণতি সাধারণ নাগরিকদের পক্ষে কখনওই সুখকর হতে পারে না।

বছর কয়েক আগে আমরা অবহিত হয়েছি যে, কেরালার সাগরতটে রয়েছে আর একটি মহাসম্পদের মস্ত ভাণ্ডার। সেই সম্পদ হলো 'মোনাজাইট'। পরমাণু বিজ্ঞানীদের একেবারে যেন চোখের মণি এই মোনাজাইট। কারণ, মোনাজাইটের মধ্যে থোরিয়াম নামক এক দূরন্ত তেজস্ক্রিয় ধাতু, — যাকে পরিহার করলে পরমাণুশক্তি তার ব্যাপকতাকে অনেকটাই হারাতে বাধ্য। এই ধাতুটির জোরেই ভারত আগামীদিনে পরমাণুশক্তিধর দেশগুলির অন্যতম হয়ে উঠবে, যদি বাসনা থাকে।

লাক্ষাদ্বীপের সাগরতলকে মহার্ঘ্য করে রেখেছে যেন সীমাহীন চুনাপাথরের তৈরি স্তূপের পর স্তূপ। যুগের পর যুগ বহুবার সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠলেও চুনাপাথরের ওইসব পাহাড়গুলিকে স্থানচ্যুত করতে পারেনি। ইত্যাকার সম্পদের ওজন যে ৩২ কোটি টনেরও বেশি, হিসেব কষে বলা যাচ্ছে। কেবল তো চুনাপাথর নয়, সেখানে রয়েছে তাল তাল সোনা, তামা, ইলমেনাইট, ফসফেট ইত্যাদি। আবিষ্কারের পর্ব এখনো অব্যাহত। জলের তলায় প্রায়শ' ঘুরপাক খাচ্ছেন ভারতের ধাতুসন্ধানীরা। এককথায়, আমরা প্রকৃতই এক বিত্তবান দেশের নাগরিক। কেবল যদি নিজেদের মেধা ও চরিত্রকে সক্রিয়তার সঙ্গে কাজে লাগাতে পারি, আমাদের জন্মভূমিই বিশ্বের সর্ববৃহৎ ধনী দেশটির সঙ্গে টক্কর দিতে পারবে অদূর ভবিষ্যতে। সেই সঙ্গে দেশকে ভালোবাসতে হবে, আত্মপ্রচারে যতটা সম্ভব অনাগ্রহী থাকতে হবে। বুদ্ধি, মেধা ও বিবেক— এই তিনের নিরিখে নিজেকে করতে হবে স্থিতপ্রজ্ঞ। যে রাজনৈতিক দলের দেশপ্রেম অপ্রতুল, তাদের প্রতি নিজস্ব সমর্থনকে এবার খারিজ করতেই হবে। এভাবেই একটা জাতি, একটা দেশ সত্যিকারের ঐতিহ্যবাহী হয়ে ওঠে। এই বোধকে পোষণ করতে যাঁরা অনিচ্ছুক, অদূর ভবিষ্যতে তাঁদের অগ্রগমন রুদ্ধ হবেই। এমত সতর্কবাণী চলমান সময়ে অতীব প্রযোজ্য। □

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম- ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

পদ্মশ্রী পুরস্কারে ভূষিত হচ্ছেন বাংলাদেশের রবীন্দ্র সংগীতশিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী

পদ্মশ্রী ভারতের চতুর্থ সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মাননা। শিল্পকলা, শিক্ষা, বাণিজ্য, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজসেবা ও সরকারি ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ভারত সরকার এই সম্মান প্রদান করে। এবার বাংলাদেশের রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যাকে এই সম্মাননায় ভূষিত করা হয়। রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আবির্ভূত একজন প্রথিতযশা রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী। তিনি বাংলাদেশের পটুয়াখালী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মাজহারউদ্দিন খান ও মাতা ইসমাত আরা খান। রবীন্দ্র সংগীত ঘরানার একজন বহুমুখী প্রতিভা হিসেবে রেজওয়ানা বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গেও ব্যাপকভাবে সমাদৃত। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছাত্রীদের মধ্যে তাঁকেই সবচেয়ে জনপ্রিয় গণ্য করা হয়। গুণমুগ্ধদের কাছে তাঁর পরিচিতি হলো 'বন্যা'। তিনি প্রাথমিক অবস্থায় বাংলাদেশের ছায়ানট এবং পরে শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তিনি সেখানে শিক্ষক হিসেবে পান গুরু শান্তিদেব ঘোষ, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা সেন ও অশেষ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো শিক্ষকদের। বাংলাদেশে ফিরে তিনি অর্থনীতি বিষয়ে পড়াশোনা করেন এবং বুলবুল ললিত কলা অ্যাকাডেমিতে ভর্তি হন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি তাঁর অধ্যয়ন সংক্ষিপ্ত করতে বাধ্য হন। রবীন্দ্র সংগীত ছাড়াও ধ্রুপদী, টপ্পা ও কীর্তন গানের ওপরও তিনি শিক্ষা লাভ করেছেন। শিক্ষাগ্রহণ সম্পন্ন হওয়ার পর থেকেই সংগীত পরিবেশন, নির্ভুল উচ্চারণ এবং সবচেয়ে কঠিন ও অপ্রচলিত গানগুলি গাইবার আগ্রহের কারণে বিশ্বভারতী ধারার একজন শিল্পী হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছেন। তিনি অনেক দেশ ভ্রমণ করেছেন এবং বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে ভারতে (পশ্চিমবঙ্গ) ও বাংলাদেশ থেকে তাঁর গানের অ্যালবাম প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৯২-তে তিনি 'সুরের ধারা' নামে একটি সংগীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। লেখালেখির সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র আছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র সংগীত নিয়ে তাঁর কয়েকটি বই আছে। সম্প্রতি ২০২১ সালে সংগীতের উপর তাঁর গবেষণালব্ধ পিএইচডি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে সম্পন্ন করেন। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগের অধ্যাপিকা ও নৃত্যকলা বিভাগের চেয়ারপার্সন হিসেবে কর্মরত। এরই সঙ্গে তিনি রবীন্দ্র সৃজনকলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশন কলা অনুষদের সাম্মানিক ডিন ও সংগীত বিভাগের প্রধান। ২০০২ সালে শ্রেষ্ঠ নারী রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী হিসেবে আনন্দ সংগীত পুরস্কারে ভূষিত হন। ২০১১ সালে কবিগুরুর ১৫০তম জন্মবার্ষিকীতে সিটি ব্যাংক প্রদত্ত 'গানে গানে গুণীজন সংবর্ধনা' ছাড়াও সিটি-সেল চ্যানেল আই মিউজিক অ্যাওয়ার্ডস্ সম্মানে ভূষিত হন তিনি। ২০১৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংস্কৃতি দপ্তর প্রদত্ত 'সংগীত সম্মান পুরস্কার' এবং ২০১৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত সর্বোচ্চ সম্মান 'বঙ্গভূষণ' পদক দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করা হয়।

বিশিষ্ট নজরুল সঙ্গীত শিল্পী ফিরোজা বেগমের স্মৃতি রক্ষার্থে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফিরোজা বেগম স্মৃতি স্বর্ণপদক ট্রাস্ট ফান্ড' কর্তৃক প্রদত্ত 'ফিরোজা বেগম স্মৃতি স্বর্ণপদক ও পুরস্কার, ২০১৭' সম্মানে ভূষিত হন এই প্রখ্যাত রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী। ২০১৬ সালে সংগীতে অবদানের জন্য বাংলাদেশের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান 'স্বাধীনতা পুরস্কার' তিনি লাভ করেন। □

অশান্ত মায়ানমার—সুযোগ নিতে তৈরি চীন : উদ্বেগ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়

জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে ভারতের প্রতিবেশী মায়ানমারের পরিস্থিতি আর এই অস্থির পরিস্থিতির ফায়দা নিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শান্তি বিঘ্নিত করতে চাইছে চীন। মায়ানমারের বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠীর সঙ্গে সীমান্তবর্তী প্রদেশে সামরিক সরকারের লড়াই এখন তুঙ্গে। এই সংঘাতের আঁচ মায়ামারের সীমান্ত ছাপিয়ে বাংলাদেশেও লাগছে বিগত কিছুদিন ধরেই।

বাংলাদেশ সীমান্তের ওপারে মায়ানমারের রাখাইন রাজ্যগুলিও মর্টারের শব্দে কাঁপছে। এখানে আরাকান আর্মির সঙ্গে তীব্র সংঘাত হচ্ছে মায়ানমার সৈন্যদের। এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষীরাও সতর্ক অবস্থানে আছে। তবে মায়ানমার-বাংলাদেশ সীমান্তে যারা বসবাস করছেন তাদের মধ্যে এক ধরনের আতঙ্ক কাজ করছে। রাখাইন অঞ্চলে আরাকান আর্মি যেভাবে শক্তি বাড়িয়ে বিভিন্ন এলাকা দখল করে নিয়েছে তাদের বিচলিত হয়ে পড়েছে মায়ানমারের সরকার। প্রসঙ্গত, তিন বছর আগে মায়ানমারে অং-সাং-সূ-চি'র নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমেক্রেসিকে হটিয়ে ক্ষমতা নেয় সামরিক সরকার।

এরপর থেকে দেশের বিভিন জায়গায় সামরিক সরকার অর্থাৎ জুন্টা-বিরোধী প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ জোরালো হতে থাকে দেশের বিভিন্ন জায়গায়। একই সঙ্গে সেদেশের বিভিন্ন জাতিগত সশস্ত্র সংগঠন তাদের শক্তি আরও বাড়িয়ে তোলে। এসব গোষ্ঠীও জুন্টা সরকারের সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই জোরদার করে। তিন বছরের মাথায় মায়ানমারের সেনাবাহিনী দেশটির শান ও রাখাইন প্রদেশে তীব্র প্রতিরোধের মুখে পড়েছে। মায়ানমারের তিনটি জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠী, যারা ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স নামে পরিচিত। তারা এই প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে।

পরিস্থিতি এমন একটা পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে, এই সংঘাত কীভাবে শেষ হবে তার কোনো সুস্পষ্ট দিশা দেখা যাচ্ছে না। গত তিন বছরে এসব গোষ্ঠী মায়ানমারে ৩০০-র বেশি সামরিক চৌকি এবং ২০টি শহর দখল করে নিয়েছে। প্রশ্ন উঠছে মিয়ানমারের সামরিক সরকার কি ভেঙে পড়বে? চীনের এখানে কী ভূমিকা হবে? মায়ানমারের ওপর একটা সময় চীনের বেশ প্রভাব ছিল। কিন্তু সে প্রভাব এখন অনেকটাই খর্ব হয়েছে। তারপরেও মায়ানমার সামরিক জুন্টা সরকার ও সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে একমাত্র মধ্যস্থতাকারী হিসেবে রয়েছে চীনই।

গত জানুয়ারি মাসে চীনের মধ্যস্থতায় তিনটি সশস্ত্র গোষ্ঠী ও জুন্টা সরকারের মধ্যে একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি হয়েছে। কিন্তু সেটি কোনো ফলপ্রসূ হয়নি। যেহেতু এই অস্ত্রবিরতি চুক্তি শুধু চীন সীমান্ত সংলগ্ন শান প্রদেশের জন্য তাই এরপরেও বিভিন্ন স্থানে সংঘাত অব্যাহত আছে। প্রসঙ্গত, এই প্রদেশটিতে ১৯৪৮ সালে মায়ানমারের স্বাধীনতা লাভের পর থেকে সংঘাত জারি আছে। এছাড়া এ প্রদেশটিতেই বিদ্রোহীরা মায়ানমার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি সাফল্যও পেয়েছে। চীনের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি সত্ত্বেও শান প্রদেশে বিক্ষিপ্ত সংঘাত চলছে। তবে দেশের অন্য জায়গায় এই যুদ্ধবিরতি কোনো কাজে লাগেনি। তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করছেন, চীন এখানে মধ্যস্থতা করেছে তার নিজের স্বার্থ সুরক্ষিত করার জন্যই। এখানে মায়ানমারের শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়টি তাদের কাছে আদপেই গুরুত্বলাভ করেনি।

যুক্তরাষ্ট্রের নর্দার্ন ইলিনয় ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক খারাফি খান এশিয়ান টাইমসে এক নিবন্ধে বলেছেন, মায়ানমারের অস্থিরতা যাতে সীমান্ত ছাপিয়ে চীনের ভেতরে না যায় সে জন্য তারা বেশ উদ্বিগ্ন। যুদ্ধবিরতি নিয়ে চীনের বিদেশ মন্ত্রকের বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, চীনের সীমান্তে তাদের অধিবাসীদের ক্ষতি না করা এবং মায়ানমারের ভেতরে চীনের প্রকল্পে যারা কাজ করছে তাদের যাতে কোনো ক্ষতি না হয় সে নিশ্চয়তা দিয়েছে উভয়পক্ষ। এখানে উভয়পক্ষ বলতে সশস্ত্র গোষ্ঠী এবং মায়ানমারের সৈন্যদের বোঝানো হয়েছে। এদিকে মায়ানমার জুন্টা সরকারের ওপর চীন 'খুশি নয়' বলে উল্লেখ করেছে ব্রাসেলসভিত্তিক গবেষণা সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপ। কারণ চীনের বিভিন্ন অপরাধী চক্র শান প্রদেশে কিংবা মায়ানমারের ভেতরে বসে নানা ধরনের সাইবার-অপরাধ, মাদক মানবপাচারের সঙ্গে জড়িত। বিষয়টি চীনের জন্য প্রভূত মাথাব্যথা তৈরি করলেও মায়ানমারের জুন্টা সরকার সেটি দমনের ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।

উল্লেখ্য, মায়ানমারের জুন্টা-বাহিনী ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অভ্যুত্থানের পর গত বছরের অক্টোবরে উত্তর মায়ানমারের তিন বিদ্রোহী গোষ্ঠী— মায়ানমার ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স আর্মি (এমএনডিএএ), তা আং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (টিএনএলএ) এবং আরাকান আর্মি (এএ) সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মিলিত লড়াই শুরু করে। গত ডিসেম্বরের মাঝের দিকে মায়ানমারের উত্তরাঞ্চলের রাখাইন প্রদেশের বেশিরভাগ শহরের দখল নেয় বিদ্রোহীরা। ওই সময় আরাকান আর্মি (এএ) জানায়, তারা রাখাইন রাজ্যের ১৭টি শহরের মধ্যে অন্তত ১৫টি এবং প্রতিবেশী চীন রাজ্যের পালেতওয়া শহরের দখল সামরিক বাহিনীর কাছ থেকে পুনরুদ্ধার করেছে। এই দুই রাজ্যে সেনাবাহিনীর ৩০০টি সামরিক চৌকির দখলও নিয়েছে তারা। সবমিলিয়ে, মায়ানমারের এই অশান্ত পরিবেশ-পরিস্থিতি যুদ্ধবাজ চীনের কাছে ঘোলা জলে মাছ ধরবার সুযোগ দিয়েছে। যা অবশ্যই ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলির মাথাব্যথার কারণ।

শীতকে ফ্লু বা ভাইরাস ছড়ানোর মরসুমই বলা যেতে পারে

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

শীতকাল ফ্লু বা ভাইরাস ছড়ানোর মরসুম। শীতে প্রতিবার সারাবিশ্বে ৫০ লক্ষ লোককে আক্রান্ত করে। কেড়ে নেয় আড়াই লক্ষ মানুষের প্রাণ। কিন্তু ভাইরাস ছড়ানোর জন্য শীতই কেন 'মোক্ষম' সময় হয়ে ওঠে, তা আজও অজানা থেকে গেছে। বিগত ও সাম্প্রতিক বিভিন্ন গবেষণা ও নথিপত্র ঘেঁটে সম্প্রতি এই বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক একটি স্বাস্থ্য পত্রিকা। এতে শীতই কেন ভাইরাস ছড়ানোর 'মোক্ষম' সময় এবং ভাইরাস থেকে সুরক্ষিত থাকতে করণীয়-সহ বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরা হয়। প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছে, কার্যকারিতা বিবেচনায় ভাইরাস খুব দ্রুতই পরিবর্তিত হয়। এ কারণে পরবর্তী মরসুমের ধকল সামলানোর জন্য মানুষের শরীর প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ পায় না। অর্থাৎ এক মরসুমের ভাইরাস সামলানোর জন্য আমাদের শরীরে যে প্রতিরোধক গড়ে ওঠে, পরবর্তী মরসুমে আসা ভাইরাসকে সে প্রতিরোধ করতে পারে না। আর এ-কারণেই ভাইরাস প্রতিরোধক ভ্যাকসিনও বানানো যায় না। আবিষ্কার করা যায় না ভাইরাস থেকে সুরক্ষার নতুন কোনও পথও। আবার ভাইরাস ছড়ানোর জন্য শীত 'মোক্ষম' সময় হয়ে ওঠার কারণ হিসেবে বিগত গবেষণাগুলো আমাদের জীবনাচারণকেও দায়ী করেছে। এর মধ্যে ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ রেখে আড্ডা গল্পগুজবের কথা উল্লেখ করা যায়। দরজা-জানালা বন্ধ থাকলে আমরা যে কাশি বা হাঁচি দিই, তার মাধ্যমে সৃষ্ট জীবাণু ঘরেই থেকে যায়। এর সঙ্গে যুক্ত হয় বাইরের অথিতিদের নিয়ে আসা জীবাণুও। তাছাড়া, শীত থেকে বাঁচতে বাস-ট্রেনে দরজা-জানালা বন্ধ করে যাতায়াতও জীবাণু সংক্রমণে উল্লেখযোগ্য ভাবে দায়ী।

শীতকালটায় অনেক সময়ই শরীর সূর্যের আলো পায় না। এতে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিকারী ভিটামিন ডি থেকে বঞ্চিত থাকতে হয় আমাদের। অর্থাৎ ভিটামিন-ডি না পাওয়ায় আমাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে। আবার আমরা যখন ঠান্ডা বাতাসে

শ্বাস-প্রশ্বাস নিই, তখন আমাদের নাকের বন্ধপ্রায় রক্তনালীগুলোর কারণে ভেতর থেকে গরম বের হতে পারে না। এর ফলে জীবাণুর বিরুদ্ধে লড়াইকারী সাদা রক্তকোষগুলো তাদের কার্যক্রমে বাধা পায় এবং একসময় সেগুলো নিষ্ক্রিয়ও হয়ে যায়। শীত মরসুমে ভাইরাস ছড়ানোর কারণ পুরোপুরি জানা না গেলেও অনেক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানী মনে করেন, এর উত্তর আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের বাতাসেই উড়ছে। ঠান্ডা বাতাসে এমনিতেই জলীয় বাষ্প কম থাকে। আর আবহাওয়া যখন স্যাঁৎস্যাঁতে বা আর্দ্র থাকে তখন ঠান্ডা বাতাসে আর্দ্রতা ঝরে পড়ে, আবহাওয়া হয়ে ওঠে আরও শুষ্ক। গত ক'বছরের বেশ কিছু গবেষণা মতে, এ-ধরনের শুষ্ক আবহাওয়াই ভাইরাস ছড়ানোর সবচেয়ে 'মোক্ষম' পরিবেশ হয়ে ওঠে। ওইসব গবেষণা অনুযায়ী, আর্দ্র আবহাওয়ায় রোগ-ব্যাধি শরীরে ঢোকার জন্য সুযোগ খুঁজতে থাকে। যখনই অবহাওয়ায় খানিকটা শুষ্কতা দেখা যায়, তখনই রোগ-ব্যাধি দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। ৩০ বছরের জলবায়ু পরিবর্তন এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নথি বলছে, আবহাওয়ায় আর্দ্রতা খানিক কাটলেই মহামারি আকারে ছড়ায় ফ্লু। ২০০৯ সালের সোয়াইন ফ্লু পরবর্তী গবেষণাও এই তথ্যই প্রতিষ্ঠিত করেছে।

একথা সবার জানা যে, যখন কেউ জনসমাগমে চলাফেরা করে, তখন তাকে হাঁচি-কাশিতে সৃষ্ট জীবাণুযুক্ত বাতাসেই শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে হয়। যেহেতু শীতের শুষ্ক আবহাওয়ায় হাঁচি-কাশির জীবাণু বেশ কিছুদিন ধরেই বাতাসে থেকে যায়, সেজন্য অনেকেই সাধারণত মাস্ক বা মুখোশ পরেন। কিন্তু এটা কি নিজেকে সুরক্ষার কার্যকর পদ্ধতি? অস্ট্রেলিয়ায় পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা যায়, ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত এমন একটি পরিবারের সদস্যরা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন, যাঁদের আত্মীয়স্বজন-প্রতিবেশীরা মুখোশ পরেছে ঠিকই, কিন্তু তাঁদের সংক্রমণ থেকে সুরক্ষা দিতে পারেনি। তাঁদের এই মুখোশ পরিধান ৮০ শতাংশ কাজ করছে। কিছু বিশেষজ্ঞ বলেন, সাধারণত আমরা রোগ থেকে সুরক্ষিত থাকার উপায় খোঁজার চেয়েও অসুস্থতার কারণ নিয়ে বেশি ভাবি। কিন্তু হাঁচি-কাশির অভিশাপের বিষয়ে কোনও চিন্তা করি না। তাঁরা বলেন, শীতে নাক ও মুখ থেকে কফ জাতীয় পদার্থ ফেলি। আর্দ্র আবহাওয়ায় এগুলো মেঝেতে বা কোনও স্থানে থেকে যায়, আর শুষ্ক আবাহাওয়ায় এগুলো ক্ষুদ্রাকারে ছড়িয়ে পড়ে বাতাসে। এসবের করণে সৃষ্ট জীবাণু শীতে মৃত কোষের মাধ্যমে যায় আমাদের শরীরে। সঙ্গে শরীরে প্রবেশ করে ঘর ঘুরে যাওয়া অতিথিদের জীবাণুও। তাছাড়া, বাতাসের বাষ্প এমনিতেই জীবাণুতে ভরা থাকে। শেষে অম্লতা ও ঘন লবণাক্ততার পরিবর্তনের মাধ্যমে আর্দ্র আবহাওয়া ভাইরাসকে অকার্যকর করে ফেলতে পারে। এতে সাধারণত আমাদের কোষে ভাইরাস যেভাবে আক্রমণ করতে পারে, সে ক্ষমতা আর ধরে রাখতে পারে না। অন্যদিকে শুষ্ক বাতাসে ভাইরাস বেশ কিছু সময় থেকে যেতে পারে, এমনকী আমরা শ্বাস না নেওয়া পর্যন্তও কার্যকর থাকতে পারে। তাহলে এখন কী করণীয়? বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, একটি এয়ার হিউমিডিফায়ার (আর্দ্রতা ধরে রাখার ডিভাইস) একটি স্কুলে এক ঘণ্টা ব্যবহার করলে ৩০ শতাংশ ভাইরাস ধ্বংস হয়ে যায়। এর পাশাপাশি ভ্যাকসিন গ্রহণ এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলাই এখন পর্যন্ত স্বাস্থ্য সুরক্ষিত করবার সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। □

নবনির্মিত রামমন্দিরে ২৫ লক্ষ ভক্তের দর্শন, সংগৃহীত প্রণামী ১১ কোটি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ শ্রীরামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও রামমন্দির উদ্বোধনের পর অতিবাহিত প্রথম ১১ দিনে প্রায় ২৫ লক্ষ ভক্ত দর্শন করেছে। সব মিলিয়ে মন্দিরের

তহবিলে প্রণামী বাবদ সংগৃহীত হয়েছে ১১ কোটি টাকারও বেশি। এর মধ্যে নগদে সংগৃহীত হয়েছে ৮ কোটি। মোট ৪টি দান বাক্স রয়েছে রামমন্দিরে। প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা অনলাইনের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়েছে। শ্রীরামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের কার্যালয় প্রভারী প্রকাশ গুপ্তা জানান, মন্দিরের গর্ভগৃহ যেখানে ভগবান রামলালার অবস্থান, তার সামনে দর্শনপথের সন্নিকটে প্রণামী বাক্সগুলি স্থাপিত হয়েছে। এছাড়াও, প্রণামী সংগ্রহের ক্ষেত্রে ১০টি কম্পিউটারাইজড কাউন্টারও খোলা হয়েছে। কাউন্টারগুলিতে ১১ জন ব্যাংক কর্মচারী ও মন্দির ট্রাস্ট নিযুক্ত ৩ জন, মোট ১৪ জন কর্মচারী প্রণামী বাবদ অর্থ সংগ্রহ এবং সন্ধ্যাবেলা কাউন্টার বন্ধ হলে তার হিসেব নিকেশ ও ট্রাস্ট কার্যালয়ে সেই অর্থ জমা করার কাজে যুক্ত। সব কটি কাউন্টার ও প্রণামী সংগ্রহ বাক্স রয়েছে সিসিটিভি পর্যবেক্ষণের অধীনে।

জ্ঞানবাপীতে ‘ব্যাস কা তেহখানায়’ পুজোর অনুমতি হিন্দুদের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বিতর্কিত জ্ঞানবাপী মসজিদের নীচের তল বা বেসমেন্টে পুজো করতে পারবে হিন্দু মামলাকারীরা। গত ৩১ জানুয়ারি এমনটাই রায় দিয়েছে বারাণসী আদালত। এ দিন আদালতের তরফে জ্ঞানবাপী মামলার শুনানিতে বলা হয়, বিতর্কিত মসজিদের ‘ব্যাস কা তেহখানা’, যা বর্তমানে সিল করা রয়েছে, সেই স্থানে পুজো করতে পারবে হিন্দুরা। ভক্তদের পুজো করার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় ব্যবস্থা করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জেলা প্রশাসনকে। শ্রী কাশী বিশ্বনাথ মন্দির ট্রাস্টকে বিতর্কিত জ্ঞানবাপী মসজিদে পূজার জন্য একজন পূজারীর নামও সুপারিশ করতে বলা হয়েছে। আদালতের তরফে আগামী সাতদিনের মধ্যে ব্যারিকেড সরানো থেকে পুজোর স্থান— যাবতীয় ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত, হিন্দু পক্ষের আইনজীবী বিষ্ণু শঙ্কর জৈন আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার সমীক্ষা রিপোর্ট তুলে ধরে দাবি করেন যে বিতর্কিত জ্ঞানবাপী মসজিদের নীচে হিন্দু মন্দিরের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছে। মন্দিরের কাঠামো পরিবর্তন করে তার ওপরে প্লাস্টার করে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল। বিতর্কিত জ্ঞানবাপী মসজিদের দেওয়ালে হিন্দু মন্দিরের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। ৩৪টি শিলালিপিও পাওয়া গিয়েছে। বিতর্কিত জ্ঞানবাপী মসজিদের নীচে হিন্দুদের পুজো করার অনুমতি দেন বিচারক কৃষ্ণমোহন পাণ্ডে। আদালতের সেই নির্দেশের পরই বিকেল সাড়ে ৫টায় আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন জেলাশাসক। রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ জ্ঞানবাপী মসজিদে পৌঁছন জেলাশাসক, পুলিশ কমিশনার-সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিক-সহ কাশী বিশ্বনাথ মন্দির ট্রাস্টের তরফে গণেশ্বর শাস্ত্রী দ্রাবিড়। এরপর রাত ১টা নাগাদ বিতর্কিত মসজিদের নীচে ‘ব্যাস কা তেহখানা’য় প্রবেশ করেন তাঁরা। তারপর ওমপ্রকাশ মিশ্র নামক এক পুরোহিতকে কাশী বিশ্বনাথ মন্দির ট্রাস্টের তরফে গর্ভগৃহে পূজার দায়িত্ব অর্পিত হয় এবং পূজা শুরু হয়। ৩১ বছর পর খুলল জ্ঞানবাপীর নীচের তল।

জেলা আদালতের এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এলাহাবাদ হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় আঞ্জুমান ইন্তেজামিয়া মসজিদ কমিটি। তাদের আর্জি গত ২ ফেব্রুয়ারি খারিজ করে দিল এলাহাবাদ হাইকোর্ট। বিতর্কিত জ্ঞানবাপী মসজিদ নিয়ে বারাণসী আদালতের রায় বহাল রইল। অর্থাৎ, জ্ঞানবাপী চত্বরে পুজোপাঠ চলবে বলে জানায় হাইকোর্ট। মসজিদ কমিটির আবেদন খারিজ করে বিচারপতি রোহিত রঞ্জন আগরওয়ালের সিঙ্গল বেঞ্চ বিতর্কিত মসজিদ চত্বরে যাতে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি না হয়, সেদিকে নজর দেওয়ার জন্য অ্যাডভোকেট জেনারেলকে নির্দেশ দেয়। এই মামলার পরবর্তী শুনানি ৬ ফেব্রুয়ারি। যদিও হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এবার সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার কথা জানিয়েছে আঞ্জুমান ইন্তেজামিয়া মসজিদ কমিটি।